KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হেস্টিংস স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (Sabuj Patra)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5	Year of Publication : বৈশাখ ১৩২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৮ আষাঢ় ১৩২৮ শ্রাবণ ১৩২৮ ভাদ্র ১৩২৮
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

প্রাণের কথা।

(ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে কথিত)

এ রকম সভার সভাপতির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, প্রবন্ধ পাঠকের গুণগান করা, কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালন করা আমার পক্ষে উচিত হবে কিনা সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমার বন্ধু এবং সাহিত্যিক বন্ধু। বন্ধুর মুখে বন্ধুর প্রশংসা একালে ভদ্রসমাজে অভদ্রতা বলেই গণ্য। ইংরাজীতে যাকে বলে mutual admiration, সে ব্যাপারটি আমরা নিতান্ত হাস্যকর মনে করি, অথচ একথাও সম্পূর্ণ সত্য যে গুণানুরাগ উভয়পাক্ষিক না হলে কি প্রণয় কি বন্ধুত্ব কোনটিই স্থায়ী হয় না। সে যাই হোক্ বন্ধুস্তুতি সাহিত্য-সমাজে যে নিষিদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং যেহেতু, আমি বর্ত্তমান সাহিত্য-সমাজের নানারূপ নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়ে আছি, সে কারণ আবার একটা নূতন অপরাধে অভিযুক্ত হতে, অপ্রবৃত্তি হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রবন্ধটি শুনে, আমি প্রবন্ধ-লেখকের আর কিছুর না হোক্, সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি নে। প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয় যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা যুগপৎ সৎসাহস ও দুঃসাহস। এ পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে যা সব চাইতে মূল্যবান অথচ দুর্ব্বোধ্য

অর্থাৎ জীবন, ঘটক মহাশয় তারই উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। এ অবশ্য দুঃসাহসের কাজ।

ঘটক মহাশয়ের প্রবন্ধের সার কথা এই যে উপনিষদের সময় থেকে সুরু করে অদ্যাবধি নানা দেশের নানা দার্শনিক ও নানা বৈজ্ঞানিক, জীবনসমস্যার আলোচনা করেছেন কিন্তু কেউ তার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারেন নি। আজ পর্য্যন্ত জীবনের এমন ভাষ্য কেউ করতে পারেন নি, যার উপর আর টীকা টীপ্পনি চলে না।

আমার মনে হয় দর্শন বিজ্ঞানের এ নিষ্ফলতার কারণও স্পষ্ট। জীবন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করবার পক্ষে প্রতি লোকের পক্ষে যে বাধা, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও সেই একই বাধা রয়েছে। জীবন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করবে মৃত্যু। মৃত্যুর অপর পারে আছে, হয় অনন্ত জীবন নয় অনন্ত মরণ, হয় অমরত্ব নয় নির্ব্বাণ। এর কোন অবস্থাতেই জীবনের আর কোনই সমস্যা থাকবে না। যদি আমরা অমরত্ব লাভ করি, তাহলে, জীবন সম্বন্ধে আমাদের জানবার আর কিছু বাকি থাকবে না—অপর পক্ষে যদি নির্ব্বাণ লাভ করিত জানবার কেউ থাকবে না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে সমগ্র মানবজাতি, না-মরাতক্ এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করতে পারবে না। আর যদি কোনদিন পারে তাহলে সেই দিনই মানবজাতির মৃত্যু হবে কেননা তখন আমাদের আর কিছু জানবার কিম্বা করবার জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল নিষ্ক্রিয় হওয়া অর্থাৎ মৃত হওয়া, কেননা প্রাণ বিশেষ্যও নয় বিশেষণও নয়—ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্র।

জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই

বলে এ রহস্যের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা, যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয় নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সবচেয়ে বড় জিনিস তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলে যাবে সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে। জীবনের যা হয় একটা অর্থ স্থির করে না নিলে, মানুষে জীবন-যাপন করতেই পারে না। এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। একথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পারুক এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড় কম লাভের কথা নয়। সত্য না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই—মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং প্রবন্ধলেখক এ আলোচনার পুনরুত্থাপন করে সৎ-সাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

(২)

সতীশ বাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন এ বিষয়ে যে নানা মুনির নানা মত আছে শুধু তাই নয়, একই রকমের মত নানা যুগে নানা আকারে দেখা দেয়। দর্শন বিজ্ঞানের কাছে জীবনের সমস্যাটা কি, সেইটে বুঝলে সে সমস্যার মীমাংসাটাও যে মোটামুটি দুশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। জীবন পদার্থটিকে আমরা সকলেই চিনি, কেননা সেটিকে নিয়ে আমাদের

নিত্য কারবার করতে হয়। কিন্তু তার আদি ও অন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ নয়। সহজ জ্ঞানের কাছে যা অপ্রত্যক্ষ অনুমান প্রমাণের দ্বারা তারই জ্ঞান লাভ করা হচ্ছে দর্শন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। জীবনের আদি অন্ত আমরা জানিনে, এই কথাটাকে ঘুরিয়ে দু রকম ভাবে বলা যায়। এক জীবনের আদিতে আছে জন্ম আর অন্তে মৃত্যু—আর এক জীবন অনাদি ও অনন্ত। জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক-তত্ত্ব হয় এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষভুক্ত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এ দুয়ের কোন মীমাংসাতেই আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র এগোয় না, অর্থাৎ এ দুই তত্ত্বের যেটাই গ্রাহ্য করো না, যা আমাদের জানা তা সমান জানাই থেকে যায়, আর যা অজানা তাও সমান অজানা থেকে যায়। সুতরাং এরকম মীমাংসাতে যাঁদের মনস্তুষ্টি হয় না—তাঁরা প্রথমে জীবনের উৎপত্তি ও পরে তার পরিণতির সন্ধানে অগ্রসর হন। মোটামুটি ধরতে গেলে, একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান করে বিজ্ঞান, আর পরিণতির দর্শন।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেহও আছে মনও আছে, আর এ দুয়ের যোগসূত্রের নাম প্রাণ। সুতরাং কেউ প্রমাণ করতে চান যে প্রাণ দেহের বিকার আর কেউ বা প্রমাণ করতে চান যে প্রাণ আত্মার বিকার। অর্থাৎ কারও মতে প্রাণ মূলতঃ আধিভৌতিক কারও মতে আধ্যাত্মিক। সুতরাং সকল দেশে সকল যুগে জড়বাদ ও আত্মবাদ পাশাপাশি দেখা দেয়—কালের গুণে কখনো এ মত কখনো ও মত প্রবল হয়ে ওঠে। সে মতের গুণে নয়—যুগের গুণে। আমার বিশ্বাস যে একটি তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ মূলে একই মত। কেননা উভয়

মতেই এমন একটি নিত্য ও স্থির পদার্থের কল্পনা করা হয় যার আসলে কোনও স্থিরতা নেই।

অবশ্য এ দুই ছাড়া একটা তৃতীয় ও মধ্য পন্থাও আছে, সে হচ্ছে প্রাণের স্বতন্ত্র সত্তা গ্রাহ্য করা। এই মাধ্যমিক মতের নাম Vitalism এবং আমি নিজে এই মধ্যমতাবলম্বী। আমার বিশ্বাস অ-প্রাণ হতে প্রাণের উৎপত্তি প্রমাণ করবার সকল চেষ্টা বিফল হয়েছে। এর থেকে এ অনুমান করাও অসঙ্গত হবে না, যে প্রাণ কখনো অ-প্রাণে পরিণত হবে না। তারপর জড়, জীবন ও চৈতন্যের অন্তর্ভূত যদি এক-তত্ত্ব বার করতেই হয়—তাহলে প্রাণকেই জগতের মূল পদার্থ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে আমরা বলতে পারি, জড় হচ্ছে প্রাণের বিরাম ও চৈতন্য তার পরিণাম। অর্থাৎ জড়প্রাণের সুপ্ত অবস্থা আর চৈতন্য তার জাগ্রত অবস্থা। এ পৃথিবীতে জড় জীব ও চৈতন্যের সমন্বয় একমাত্র মানুষেই হয়েছে। আমরা সকলেই জানি আমাদের দেহও আছে প্রাণও আছে মনও আছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের পক্ষে এক লম্ফে দেহ থেকে আত্মায় আরোহণ করা যেমন সম্ভব, দর্শনের পক্ষেও এক লম্ফে আত্মা থেকে দেহে অবরোহণ করাও তেমনি সম্ভব। জর্ম্মাণ দার্শনিক হেকেল এবং জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে জড়বাদী পরমাণুর অন্তরে গোপনে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করে দেন এবং জ্ঞানবাদী জ্ঞানের অন্তরে গোপনে গতি সঞ্চারিত করে দেন। তারপর বাজিকর যেমন খালি মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বার করে, এঁরাও তেমনি জড় থেকে মন এবং মন থেকে জড় বার করেন। এ সব দার্শনিক হাতসাফাইয়ের কাজ। আমাদের চোখে যে এঁদের বুজরুকি এক নজরে ধরা পড়ে না—তার কারণ—

সাজানো কথার মন্ত্রশক্তির বলে এঁরা আমাদের নজরবন্দী করে রেখে দেন। তবে দেহ মনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্রটি ছিন্ন করে, মানুষে বুদ্ধিসূত্রে যে নূতন যোগ সাধন করে, তা টেঁকসই হয় না। দর্শন বিজ্ঞানের মন-গড়া এই মধ্যপদলোপী সমাস চিরকালই দ্বন্দ্বসমাসে পরিণত হয়।

(৩)

প্রাণের এই স্বাতন্ত্র্য অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না শুধু তাই নয় Vitalism কথাটাও অনেকের কাছে কর্ণশূল। এর কারণও স্পষ্ট। Vital force নামক একটি স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান ত্যাগ করা। এ জগতের সকল পদার্থ সকল ব্যাপারই যখন জড়জগতের কতকগুলি ছোট বড় নিয়মের অধীন তখন একমাত্র প্রাণই যে স্বাধীন এ কথা বিনা পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আপাতঃ দৃষ্টিতে যা বিভিন্ন মূলতঃ তা যে, অভিন্ন এই সত্য প্রমাণ করাই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রাণ যে জড়শক্তিরই একটি বিশেষ পরিণাম, এটা প্রমাণ না করতে পারলে বিজ্ঞানের অঙ্কে একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে যায়। গত শতাব্দীতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে এই ফাঁক বোজাবার বহুচেষ্টা হয়েছে কিন্তু সুখের বিষয়ই বলুন আর দুঃখের বিষয়ই বলুন, সে চেষ্টা অদ্যাবধি সফল হয়নি। প্রাণ জড়জগতে লীন হতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাওয়ার অর্থ যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া এ কথা কে না জানে?

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে ইউরোপ যা প্রমাণ করতে পারে নি বাঙ্গলা তা করেছে, অর্থাৎ তাঁর মতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু,

হাতে কলমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জড়ে ও জীবে কোনও প্রভেদ নেই। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের সর্ব্বাগ্র-গণ্য-বিজ্ঞানাচার্য্য এ কথা কোথায়ও বলেন নি, যে জড়ে ও জীবে কোনও প্রভেদ নেই। আমার ধারণা তিনি প্রাণের উৎপত্তি নয় তার লক্ষণ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক্। মানুষমাত্রই জানে যে যেমন মানুষের ও পশুর প্রাণ আছে তেমনি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এমন কি ছোট ছেলেরাও জানে যে গাছপালা জন্মায় ও মরে। সুতরাং মানুষ পশু ও উদ্ভিদ যে গুণে সমধর্ম্মী—সেই গুণের পরিচয় নেবার চেষ্টা বহুকাল থেকে চলে আসছে। ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, assimilation এবং reproduction—এই দুই গুণে তিন শ্রেণীর প্রাণীই সধর্ম্মী। অর্থাৎ—এতদিন আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি ও শক্তিই ছিল প্রাণের Least—Common Multiple এ কালের স্কুলের বাংলায় যাকে বলে "লসাগু"।

আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন যে এ দুই ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে প্রাণীমাত্রেই সমধর্ম্মী। তিনি যে সত্যের আবিষ্কার করেছেন সে হচ্চে এই যে, প্রাণীমাত্রেই একই ব্যথার ব্যথী। উদ্ভিদের শিরায় উপশিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চার করে দিলে, ও বস্তু আমাদের মতই সাড়া দেয় অর্থাৎ তার দেহে স্বেদ কম্প মূর্চ্ছা বেপথু প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের লক্ষণ সব ফুটে ওঠে। এক কথায় আচার্য্য বসু উদ্ভিদ জগতেও হৃদয়ের আবিষ্কার করেছেন, পূর্ব্বাচার্য্যেরা উদর ও মিথুনত্বের সন্ধান নিয়েই ক্ষান্ত দিলেন। বসু মহাশয়, প্রাণের "লসাগু"তে সন্তুষ্ট না থেকে তার "গসাগু" অর্থাৎ Greatest Common Measureএর আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। যখন উদ্ভিদের হৃদয় আবিষ্কৃত হয়েছে,

তখন সম্ভবতঃ কালে তার মস্তিষ্কও আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু তাতে জড় ও জীবের ভেদ নষ্ট হবে না,—কেননা জড়পদার্থের যখন উদরই নেই, তখন হৃদয় মস্তিষ্কাদি থাক্‌বার কোনই সম্ভাবনা নেই। যে বস্তুর দেহে অন্নময় কোশ নেই তার অন্তরে মনোময় কোশের দর্শনলাভ তাঁরাই কর্‌তে পারেন, যাঁদের চোখে আকাশকুসুম ধরা পড়ে।

(৪)

আমি বৈজ্ঞানিকও নই দার্শনিকও নেই, সুতরাং এতক্ষণ যে অনধিকার চর্চ্চা করলুম তার ভিতর চাই কি কিছু সার নাও থাক্‌তে পারে। কিন্তু জীবন জিনিসটে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের একচেটে নয়, ও বস্তু আমাদের দেহেও আছে। সুতরাং প্রাণের সমস্যার আমাদেরও মীমাংসা কর্‌তে হবে আর কিছুর জন্য না হোক শুধু প্রাণধারণ কর্‌বার জন্য। আমাদের পক্ষে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্চে প্রাণের মূল্য, সুতরাং আমাদের সমস্যা হচ্চে বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের সমস্যার ঠিক বিপরীত। প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর অভেদ জ্ঞান নয়, ভেদজ্ঞানের উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত। কেননা যে গুণে প্রাণী-জগতে মানুষ অসামান্য—সেই গুণেই সে মানুষ।

উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে কোন্ কোন্ গুণে ও লক্ষণে আমরা সমধর্ম্মী, সে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মানবজীবনের মূল্য নির্দ্ধারণ কর্‌তে পারি নে, কোন্ কোন্ ধর্ম্মে আমরা ও দুই শ্রেণীর প্রাণী হতে বিভিন্ন, সেই বিশেষ জ্ঞানই আমাদের জীবন-যাত্রার প্রধান সহায়, এবং এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য আমাদের কোনরূপ অনুমান প্রমাণের দরকার নেই প্রত্যক্ষই যথেষ্ট।

আমরা চোখ মেললেই দেখ্‌তে পাই যে, উদ্ভিদ মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তার চলৎশক্তি নেই। এক কথায় উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম হচ্ছে স্থিতি।

তারপর দেখ্‌তে পাই পশুরা সর্ব্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম হচ্ছে গতি।

তারপর আসে মানুষ। যে হেতু আমরা পশু—সে কারণ আমাদের গতি ত আছেই, তার উপর আমাদের ভিতর মন নামক একটি পদার্থ আছে যা পশুর নেই। এক কথায় আমাদের প্রত্যক্ষ বিশেষ ধর্ম্ম হচ্ছে মতি।—

এ প্রভেদটার অন্তরে রয়েছে প্রাণের মুক্তির ধরাবাহিক ইতিহাস। উদ্ভিদের জীবন সব চাইতে গণ্ডীবদ্ধ অর্থাৎ উদ্ভিদ হচ্ছে বদ্ধজীব। পশু মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত—কিন্তু নৈসর্গিক স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ অর্থাৎ পশু বদ্ধমুক্ত জীব। আমরা দেহ ও মনে না মাটির না স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ অতএব এ পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র মুক্ত জীব।

সুতরাং মনুষ্যত্ব রক্ষা করার অর্থ হচ্ছে—আমাদের দেহ ও মনের এই মুক্তভাব রক্ষা। আমাদের সকল চিন্তা সকল সাধনার ঐ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে জীবন যত মুক্ত সে জীবন তত মূল্যবান। কিন্তু এ কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না, যে মানুষের পক্ষে প্রাণী-জগতে পশ্চাৎপদ হওয়া সহজ। প্রাণের প্রতি মূর্ত্ত অবস্থারই এমন সব বিশেষ সুবিধা ও অসুবিধা আছে যা, তার অপর মূর্ত্ত অবস্থার নেই। উদ্ভিদ্ নিশ্চল অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না যোগায় ত সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জ্জলা একাদশী করে শুকিয়ে মর্‌তে বাধ্য। এই তার অসুবিধা। অপর পক্ষে তার সুবিধা

এই যে তাকে আহার সংগ্রহ করবার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করতে হয় না, সে আলো বাতাস মাটি জল থেকে নিজের আহার অক্লেশে প্রস্তুত করে নিতে পারে। পশুর গতি আছে অতএব সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ অধীন নয়—সে এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে চলে যেতে পারে, এইটুকু তার সুবিধা। কিন্তু তার অসুবিধা এই যে সে নিজগুণে জড়জগৎ থেকে নিজের খাবার তৈরি করে নিতে পারে না, তাকে তৈরি-খাবার অতিকষ্টে সংগ্রহ করে জীবনধারণ করতে হয়। পোষমানা জানোয়ারের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, সে উদ্ভিদেরই সামিল—কেননা সে শিকড়বদ্ধ না হোক্ শিকলবদ্ধ।

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন হতে বাধ্য নয়, সে স্থান ত্যাগ করতেও পারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বদল করেও নিতে পারে। এ কালের ভাষায় যাকে "বেষ্টনী" বলে মানুষের পক্ষে তা গণ্ডী নয়, মানুষের স্থিতি গতি তার স্বেচ্ছাধীন। এই তার সুবিধা। তার অসুবিধা এই যে তাকে জীবনধারণ করবার জন্য শরীর ও মন দুই খাটাতে হয়। পশুকেও শরীর খাটাতে হয় মন খাটাতে হয় না, উদ্ভিদকে শরীর মন দু'য়ের কোনটিই খাটাতে হয় না। অর্থাৎ উদ্ভিদের জীবন সব চাইতে আরামের। পশুর শরীরের আরাম না থাক্ মনের আরাম আছে। মানুষের শরীর মন দু'য়ের কোনটিরই আরাম নেই। আমরা যদি মনের আরামের জন্য লালায়িত হই তাহলে আমরা পশুকে আদর্শ করে তুলব—আর যদি দেহমন দুয়ের আরামের জন্য লালায়িত হই তাহলে আমরা উদ্ভিদকে আদর্শ করে তুলব—এবং সেই আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন গঠিত করতে চেষ্টা করব। এ চেষ্টার ফলে আমরা শুধু মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসব। "স্বধর্ম্মে নিধনো-

শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহ" এই সনাতন সত্যটি মানুষের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য—নচেৎ মানবজীবন রক্ষা করা অসম্ভব। আর একটি কথা, মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে বাইরে যে গতি-শক্তি আছে তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতি গতির শুভ পরিণয়ের বলে যা জন্মলাভ করে তারই নাম উন্নতি।—আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে' তোলা ছাড়া আয়ুঃবৃদ্ধির অপর কোনও অর্থ নেই।

২৪শে জুন ১৯১৭।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কথা ও সুর।

—:০:—

সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে আমি এক সময়ে এই মত প্রকাশ করি যে, কথার রস ও সঙ্গীতের রস এক বস্তু নয়, ; এবং অধিকাংশ লোকে সঙ্গীতরসের রসিক না হলেও, তাঁরা যে গান শুনতে ভালবাসেন তার কারণ,—তাঁরা সুরসংযুক্ত কথার রসে মুগ্ধ হন। কথার রস অবশ্য প্রধানতঃ তার অর্থের উপর নির্ভর করে, অতএব কথার রস উপভোগ করার অর্থ, তার মর্ম্ম অনুভব করা। ঐ রসের সন্ধান একমাত্র অভিধানের মধ্যে পাওয়া যায়; অপরপক্ষে আমার মতে সঙ্গীতের ব্যাকরণ আছে, কিন্তু অভিধান নেই।

এর উত্তরে আমার কোনও সুগায়ক বন্ধু এই প্রশ্ন করেন যে, "তবে কি আপনি বলতে চান যে, সুর ও কথার ভিতর কোনও স্বাভাবিক যোগাযোগ নেই? আর বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে অদ্যাবধি মানুষে নিরবধি যে গান গেয়ে আসছে—তা কি সঙ্গীত নয়?"

এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার জো নেই, সুতরাং এর উত্তর দেওয়াটা কর্ত্তব্য; এবং এ প্রবন্ধে আমি সেই কর্ত্তব্য যথাসাধ্য পালন করবার চেষ্টা করব।

কথা ও সুরের যোগাযোগটা এতই প্রত্যক্ষ যে, গান যে সঙ্গীতের একটা অঙ্গ, একথা অস্বীকার করা চলে না। অপরপক্ষে এ কথাও সমান সত্য যে, যন্ত্রসঙ্গীতে কথার বালাই নেই, অথচ যন্ত্রসঙ্গীতও

সঙ্গীত—শুধু তাই নয়, অনেক গানও যন্ত্রসঙ্গীতের সামিল। অধিকাংশ হিন্দুস্থানী গানের কথার অর্থ আমরা বুঝি নে। সুতরাং মোটামুটি হিসেবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, যে-বাঙ্গালী হিন্দুস্থানী গান শুনে যথার্থ আনন্দ পান, তিনি তার সুরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন; আর যিনি বাঙ্গলা ছাড়া অপর কোনও গান শুনলে কাতর হয়ে পড়েন, তিনি বাংলা গানের কথার রস উপভোগ করেন। অর্থাৎ এর একজন হচ্ছেন সঙ্গীতরসের রসিক, আর একজন কাব্যরসের রসিক। এ উভয়ে অবশ্য আধ্যাত্মিক জগতে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব। এঁরা এক দেশের অর্থাৎ ভাবরাজ্যের অধিবাসী হলেও, এক জাত নন। রবীন্দ্রনাথের রূপকের ভাষায় বলতে গেলে, সুরপ্রাণ লোকের ঠিকানা হচ্ছে ১লা নম্বর, এবং কথাপ্রাণ লোকের ২রা নম্বর; এবং এ উভয়ে পরস্পর পরস্পরের প্রতিবেশী হলেও প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের একের ভাষা অপরে বুঝতে পারে না, সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট বোঝাপড়া হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমরা যখন সিতাংশু মৌলীও নই, অদ্বৈতচরণও নই—কিন্তু এ দুয়ের মধ্যস্থ জীব;—অর্থাৎ আমরা যখন উভয়ের আসরেই সমান আড্ডা জমাই, তখন আমাদের পক্ষে সুর ও কথার মিলনের রহস্য উদ্ঘাটন করবার অন্ততঃ চেষ্টা করাটাও দরকার।

(২)

প্রথমত, কথার দলের মত শোনা যাক্। অদ্বৈতচরণ বলেছেন :—
"ভাষার অভাবে মানুষ যখন বোবা ছিল, তখনই গানের উৎপত্তি—

তখন মানুষ চিন্তা করতে পারত না বলে চীৎকার করত।" অর্থাৎ মানুষের আত্মপ্রকাশের আদিম চেষ্টার ফল কণ্ঠসঙ্গীত। শুনতে পাই এ হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। গান থেকে যে ভাষার উৎপত্তি হয়েছে, এ বৈজ্ঞানিক মত গ্রাহ্য করবার পক্ষে কিন্তু অনেক বাধা আছে। গানের সৃষ্টি বোবায় করেছে, এ কথা বলাও যা,—আর নাচের সৃষ্টি খোঁড়ায় করেছে, এ কথা বলাও তাই। এরকম কথা বিজ্ঞানে বল্‌লেও, সজ্ঞানে বলা যায় না। আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ চেষ্টার ফলে বোবার কণ্ঠ হতে যে ধ্বনি নির্গত হয়, একালে আমরা তাকে সঙ্গীত বলি নে, সুতরাং সেকালের সেই জাতীয় ধ্বনিকে সঙ্গীত বলবার কোনই কারণ নেই। ব্যথায়, আহ্লাদে, আমরাও চীৎকার করি, কিন্তু সে চীৎকার-ধ্বনি সঙ্গীতের নয়, ভাষার অন্তর্ভূত—কেননা উক্ত উপায়ে আমরা কেবল সজোরে আমাদের মর্ম্মান্তিক ভাবই প্রকাশ করি। শুধু তাই নয়,—বীর, করুণ, ভয়ানক, বীভৎস প্রভৃতি রস চীৎকারের সাহায্যে যেমন পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করা যায়—কোনও কথার সাহায্যে তার সিকির সিকিও করা যায় না। চীৎকার সঙ্গীত নয়,—ও একরকম কথা; যেমন অনেক স্থলে কথাও একরকম চীৎকারবিশেষ। এর প্রমাণের জন্য বেশী দূর যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের মাসিক সাপ্তাহিক পত্রপত্রিকাগুলির সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, বাঙ্গলার বর্ত্তমান সমালোচনাসাহিত্যে চীৎকার ব্যতীত আর বড় কিছু নেই। গান যে ভাষার আদিম রূপ নয়, তার অকাট্য প্রমাণ এই যে, যদি তা হত, তাহলে ভাষা তার স্বরূপ লাভ করবামাত্র গান বাতিল হয়ে যেত। কিন্তু আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে, পৃথিবীতে সঙ্গীত, ভাষার পাশাপাশি এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি লাভ

করছে, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সুর ও কথার ভিতর সম্বন্ধ যতই ঘনিষ্ঠ হোক, তা পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নয়।

(৩)

আমার বিশ্বাস, কথা ও সুর সহোদর—নাবালক অবস্থায় এ দুটী একান্নবর্ত্তী ছিল, সাবালক হয়ে উভয়ে পৃথক হয়ে গেছে। শব্দমাত্রই ধ্বনি, সুতরাং কথামাত্রেরই ঝোঁকও আছে, টানও আছে; অর্থাৎ প্রতি কথার অন্তরেই তাল ও সুরের উপাদান অল্পবিস্তর বর্ত্তমান। সেই উপাদান কথা থেকে পৃথক করে নিয়ে, টানের বিস্তার ও সঞ্চার করে, এবং ঝোঁককে প্রস্ফুটিত ও গুম্ফিত করে মানুষে সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে। কথার ভিতর সুর, কিম্বা সুরের ভিতর কথা প্রক্ষিপ্ত করে, সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় নি।

(৪)

কণ্ঠসঙ্গীতই অবশ্য সঙ্গীতের আদিমরূপ। কেননা কণ্ঠ হচ্ছে মানুষের হাতেগড়া নয়, পড়ে-পাওয়া যন্ত্র। এবং সুর ও কথা দুই যখন ঐ এক যন্ত্রেই তৈরি হয়—তখন দুয়ের আদিম মিশ্রণটা নিতান্তই স্বাভাবিক, কেননা অনিবার্য্য। এ মিশ্রণ কিন্তু রাসায়নিক নয়—যান্ত্রিক। জীবজগতে এক শ্রেণীর জীব আছে, যারা একাধারে উদ্ভিদ ও জন্তু; গানও হচ্ছে আর্টের জগতে সেই শ্রেণীর পদার্থ—ও বস্তু একাধারে কাব্য ও সঙ্গীত। কিন্তু গানের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, কণ্ঠসঙ্গীতেও সুর ক্রমে ক্রমে কথার

বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছে। আমাদের হিন্দুসঙ্গীতের ইতিহাসে সঙ্গীতের মুক্তির সোপানগুলি দিব্যি পর পর সাজানো আছে।

প্রথম আসে ধ্রুপদ। ধ্রুপদে কথা ও সুরের ভিতর সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। এ ক্ষেত্রে সুর ছাড়া কথাও নেই, কথা ছাড়া সুরও নেই।

তারপর আসে খেয়াল। খেয়ালে সুরের সঙ্গে কথার সম্পর্ক নামমাত্র। এমন কি, এ ক্ষেত্রে কথা শুধু নামকো ওয়াস্তে—সুরই হচ্ছে সার। খেয়ালে সুর কথাকে পিছনে ফেলে নিজের খেয়ালে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, এবং শ্রান্ত হলে কথার ঘরে বিশ্রাম কর্‌তে আসে মাত্র।

তারপর আসে আলাপ। আলাপে সুর কথার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখে না। সেইজন্যে আলাপের সুর কণ্ঠনিঃসৃত হলেও, যন্ত্র-সঙ্গীতের কোঠায় এসে পড়ে; এবং সেইজন্যে তা পূর্ণ সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। বলা বাহুল্য, সঙ্গীত যন্ত্রস্থ হয়েই যথার্থ মোক্ষলাভ করে।

অপরপক্ষে ভাষা যখন নিজের স্বাতন্ত্র্য লাভ করে—তখন সে সুরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কাব্য যত মহান হয়, ততই তা রাগরাগিণীনিরপেক্ষ হয়ে ওঠে। কাব্য যতদিন নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে না পারে, ততদিনই তা সুরের কোলে চড়ে বেড়ায়। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সুর যে-পরিমাণে কথা থেকে পৃথক হয়, সেই পরিমাণে তা সঙ্গীত হয়ে ওঠে, এবং কথা যে পরিমাণে সুর থেকে পৃথক হয়, সেই পরিমাণে তা ভাষা হয়ে ওঠে। মুখে অর্থাৎ মূলে যা ছিল এক, কালক্রমে তা আর্টের অর্থাৎ মানুষের

আত্মপ্রকাশের রাজ্যে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে। স্বরের একদিকে চরম বিকাশ হচ্ছে অর্থমুক্ত আনন্দঘন যন্ত্রসঙ্গীত,—আর একদিকে চরম বিকাশ হচ্ছে সুরমুক্ত চিদ্‌ঘন কাব্যসাহিত্য।

কিন্তু চরম বিকাশ হলেও, এ উভয়েরি কৃত্রিম হয়ে পড়বার একটা বিশেষ সম্ভাবনা আছে। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সকল পদার্থই শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। কি সঙ্গীত, কি সাহিত্য, যখন শুষ্ক কাষ্ঠ হয়ে ওঠে—তখন তার অন্তরে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার জন্য আমাদের আবার মূলে ফিরে যাওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ সুর ও কথার পুনর্মিলন ঘটানো আবশ্যক। এই জন্যেই যুগে যুগে নতুন গান সৃষ্টি করা দরকার, নচেৎ কি সঙ্গীত, কি কাব্য, কোনটিকেই জিইয়ে রাখা যায় না। এক কথায় সঙ্গীতের স্থিতির জন্য সুর ও কথার যোগ, এবং তার উন্নতির জন্য ও-দুয়ের বিয়োগ আমাদের করতেই হবে। এ জগতের অনেক ক্ষেত্রেই পালায় পালায় এই রকম যোগ বিয়োগ ঘটে থাকে। প্রকৃতি যে গিঁট একবার খোলেন, কখন কখন তা আবার পাকা করে বাঁধেন। উদাহরণ—evolution of sex.

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বাঙ্গলা-ভাষার কুলের খবর।

—:০:—

শুনতে পাই এ দেশে এমন সব বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক আজও আছেন, যাঁদের বিশ্বাস যে বাংলা-ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ।

এ বিশ্বাস যে অমূলক, বাংলা যে সংস্কৃতের দুহিতা হওয়া দূরে থাক, দৌহিত্রীও নয়—কিন্তু মাগধী প্রাকৃতের বংশধর—এ সত্যের যাঁরা প্রমাণ দেখতে চান, তাঁদের আমি গত আষাঢ় মাসের "প্রতিভা" পত্রে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের "বাঙ্গলা-ভাষা" নামক প্রবন্ধটির প্রতি মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি। চন্দ মহাশয়ের লেখার সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, যার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ নেই, এমন কথা বলা তাঁর অভ্যাস নেই। এবং তিনি প্রাচীন দলিলপত্র হতে প্রমাণ সংগ্রহ করবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম, যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করে থাকেন। চন্দ মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের হয়ে যে সকল গুণের দাবী করেছেন, যথা—"পরিশ্রম, রীতিমত বিচার, সহন, ধৈর্য্য" ইত্যাদি, তাঁর প্রবন্ধে সে-সকল গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের সত্য নিজের অন্তরে আবিষ্কার করবার সহজ উপায়টি কোনও কোনও বাঙ্গালী ঐতিহাসিক আজও ত্যাগ করেন নি, সুতরাং তাঁদের আবিষ্কার তাঁদের মনঃপূত হলেও সকলের মনঃপূত হয় না। যাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাঙ্গালী জাতির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন না,—তাঁরা বাংলা-ভাষার

স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়লাভে আনন্দিত হবেন; কেননা সংস্কৃতের অধীনতার চাপে বর্ত্তমানে বাংলা আড়ষ্ট হয়ে রয়েছে—অথচ বাংলা-ভাষাকে শাসন করবার কোনও অধিকার সংস্কৃতের যে নেই—চন্দ মহাশয় এই সত্যটি প্রমাণ করেছেন।

(২)

একদল ইউরোপীয় পণ্ডিত বহুকাল থেকে ভারতবর্ষের প্রাকৃতের চর্চ্চা করে আসছেন। এবং এঁদের অগাধ পরিশ্রমের ফলে এই সত্য আবিষ্কৃত হয় যে, মাগধী প্রাকৃত ত্রিধারায় বিভক্ত হয়ে কালক্রমে উড়িয়া, বাংলা ও আসামীরূপ ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেছে। কিন্তু বাংলা-ভাষা কোন যুগে তার বিশিষ্ট রূপ লাভ করে—তার প্রমাণ আমরা আজও পাই নি। এ ক্ষেত্রে দলিলপত্রের একান্ত অভাব। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কিছুদিন পূর্ব্বে নেপাল থেকে কতকগুলি বৌদ্ধ দোঁহা ও পদাবলী সংগ্রহ করে এনেছেন, যা নাকি তাঁর মতে হাজার বৎসরের আগেকার বাংলায় লেখা। অধ্যাপক বেণ্ডল এ ভাষাকে অজ্ঞাতকুলশীল ভাষা বলে বর্ণনা করে গিয়েছেন। আমার কানেও এ ভাষার সুর কখনো বাংলা বলে ঠেকে নি। বহু শব্দের শেষে অযথা আকার সংযুক্ত থাকায়, এই সকল দোঁহা ও চর্য্যাপদের অধিকাংশ পদের চেহারা একটু খোট্টাই হয়ে উঠেছে। চন্দ মহাশয় বলেছেন যে—"এ ভাষা ত বাঙ্গলা নয়ই; ইহা হাজার বছর পূর্ব্বের বাঙ্গলার ভাষা অর্থাৎ প্রাচ্য অপভ্রংশ কিনা, তাহাও বলা কঠিন"। এ বিষয়ে কোনও কথা জোর করে বলবার অধিকার

আমার নেই। তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, এ ভাষা যে বাংলা, শাস্ত্রী মহাশয় নিঃসংশয়ে তা প্রমাণ করতে পারেন নি;—বলা বাহুল্য এ ক্ষেত্রে প্রমাণের ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত। দোঁহাকার ও পদকারেরা এ ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বলেছেন। আমার বিশ্বাস এই নামই ঠিক। এ ভাষা বাংলা-ভাষার উদয়ের ভাষা নয়—সম্ভবতঃ কোনও প্রাকৃতের অস্তের ভাষা। অপরপক্ষে এমনও হতে পারে যে, বাংলা ও হিন্দির সন্ধিতে এ ভাষার জন্ম। এ ভাষা যদি বাঙ্গলার প্রাচীন ভাষা হয়, তাহলেও এতে এতটা হিন্দির ভেজাল আছে যে, একে একটা দো-আঁসলা ভাষা বলাই নিরাপদ।

(৩)

"বাংলাভাষা" কথাটার ভিতর দ্ব্যর্থ আছে, কেননা এখন বাঙ্গলা-দেশে একটি নয়, দুটি ভাষার চলন আছে। এর একটি লেখার, আর একটি কথার ভাষা। আকারে প্রকারে এ দুয়ের ভিতর যে প্রভেদ আছে, সে কতকটা ব্রাহ্মণশূদ্রের প্রভেদের অনুরূপ। সাধু-ভাষার পাণ্ডাদের মতে, সরস্বতীর মন্দিরে খাঁটি বাংলার প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং বাংলাভাষার উৎপত্তি নির্ণয় করতে হলে—এই সাধুভাষার কুলের খবরও নেওয়া দরকার। প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত সেনার (Senart) ভারতবর্ষে জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করবার চেষ্টায় বিফল হয়ে, শেষটা হতাশ ভাবে এই কথা বলেন যে, "হিন্দুস্থানের আবহাওয়ায় এমন কিছু আছে, যার গুণে এদেশে কোনও জিনিষই গোটা থাকে না—সবই টুকরো হয়ে পড়ে"।—এক কথায় এ দেশ হচ্ছে ভগ্নাংশের দেশ। চন্দ মহাশয় কিন্তু হতাশ হবার লোক নন। যিনি

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাস উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন, তিনি যে বাংলাভাষার জাতিভেদের কারণ নির্ণয় না করে ক্ষান্ত হবেন, এ হতেই পারে না। বিশেষতঃ এ প্রভেদের মূল যখন একালের ভিতরেই পাওয়া যায়। চন্দ মহাশয়ের মতে সেকালে এ দেশে একটিমাত্র ভাষা ছিল—যে ভাষাকে আমরা শূদ্র বলি;—এই শূদ্র ভাষার অন্তর থেকেই ব্রাহ্মণ ভাষার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং সাধুভাষা হচ্ছে বর্ণব্রাহ্মণ ভাষা। লেখার ভাষার এই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার মূলে আছে রাজপ্রসাদ। নবাবী আমলে গৌড়ের রাজ-দরবারে বাংলাভাষার উপনয়ন হয়, পরে ইংরাজি আমলে কলকাতার কেল্লায় তা পূর্ণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। চন্দ মহাশয় তাই বলেন যে, এই "সাধুভাষাকে King's Bengalee বা রাজার বাংলা বলা যাইতে পারে।" এই প্রবন্ধেই চন্দ মহাশয় সাধুভাষাকে কোথায়ও "রাজভাষা" কোথায়ও বা "রাজার দুলালী" ভাষা বলেছেন। এর পরে আলালী ভাষার পক্ষে কোনও কথা বল্‌লে, সে কথা অবশ্য বিদ্রোহ বলেই গণ্য হবে। চন্দ মহাশয় তাই সাধুভাষার বিপক্ষ দলকে "বিদ্রোহী দল" বলতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর মতে এ "বিদ্রোহের প্রকৃত নায়ক স্যর রবীন্দ্রনাথ।" কেননা তিনি "গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় বাংলা গদ্যে দেশী শব্দের ব্যবহারবিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সাহস দেখাইয়াছেন"। কথা সত্য।

(৪)

চন্দ মহাশয়ের নির্ণীত সাধুভাষার নিদান যে ঠিক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যে হিসেবে ইংরাজি সাহিত্যের ইংরাজি

King's English সে হিসেবে সাধুভাষা King's Bengalee নয়;—কেননা এ ভাষা বাদশার আমলেও Court language ছিল না—ইংরাজের আমলেও তা হয় নি। খাঁটি বাংলার মত সাধু বাংলাও চিরদিন রাজদরবার থেকে তিরস্কৃত হয়ে রয়েছে। সাধুভাষা রাজার ফরমায়েসে তৈরি হলেও রাজভাষা নয়,—সংক্ষেপে সাধুভাষা কেতাবি হলেও খেতাবি নয়। চন্দ মহাশয় স্বীকার করেন যে, এ ভাষা একটা "কৃত্রিম" ভাষা। তাঁর নিজের কথা এই;—

"ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের.....পণ্ডিত মহাশয়েরা, পণ্ডিত জনে পড়াইতে পারেন, এমন ভাষা গড়িয়া তুলিলেন। তদ্ভব ও দেশী শব্দ ভাষা হইতে তাড়িত হইল।.....এই বাংলা গদ্য ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে পড়িয়া, এমন কৃত্রিম বস্তুর যতটা সজীব, সরস ও সহজ হওয়া সম্ভব, ততটা তেমন হইয়াছিল।"

এই কথাই ত আমি চিরদিন বলে আসছি, সুতরাং আমার সঙ্গে চন্দ মহাশয়ের মতের গরমিলটা যে কোথায়, তা একটু খুঁটিয়ে দেখা আবশ্যক। চন্দ মহাশয় বলেছেন:—

"শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় লেখ্যভাষার সংস্কারসম্বন্ধে বিদ্রোহীদলের অনুযায়ী দুইটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব দুইটি এই.....

(১) অনেক কথা যা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সংস্কৃতের অত্যাচারে যা আজকাল আমাদের সাহিত্যের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে, তা আবার লেখায় ফিরিয়ে আনতে হবে।

(২) মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকারের ও বিভক্তির যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে সেটা মেনে নিয়ে, তাদের বর্ত্তমান আকারে ব্যবহার করাই শ্রেয়।"

এ প্রস্তাব দুটি সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় বলেন.....

"প্রথম প্রস্তাবটি খুবই ভাল। এখন বাহিরে পড়িয়া আছে, এমন বাঙ্গলা কথা লেখ্য ভাষার ভিতরে টানিয়া আনিয়াই আমাদের থামিয়া যাওয়া ঠিক নয়। লেখ্যভাষার ভিতরে যে সকল সংস্কৃত শব্দ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেগুলি বাদ দিলে চলিতে পারে, সেইগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত"।—উদাহরণস্বরূপ তাঁর মতে "বহির্ভূত" শব্দটিকে বঙ্গ-সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত করা দরকার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, এ বিষয়ে চন্দ মহাশয় আমাকেও ছাড়িয়ে যান। আমি, কি তদ্ভব কি তৎসম, কোন শব্দকেই বয়কট করবার পক্ষপাতী নই। আমার মত এই যে, যে-সকল সংস্কৃত শব্দকে সাধুভাষীরা নির্ব্বিচারে বঙ্গ সাহিত্যে অবরুদ্ধ করেছেন, এখন তাদের কোন কোনটিকে মুক্তি দিতে হবে—কিন্তু সে বিচার করে।

আমার দ্বিতীয় প্রস্তাব তিনি অবশ্য গ্রাহ্য করেন না। তিনি বলেন ধর্ম্মকর্ম্মের বদলে ধম্মকম্ম সাহিত্যে চল্‌বে না। অবশ্য চলবে না, এবং আমরা তা চালাতেও চাই নে,—কেননা আমরা মুখেও বলি ধর্ম্মকর্ম্ম। যদি কোনও প্রদেশের মৌখিক ভাষায় ও-দুটি শব্দ রেফভ্রষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে সে প্রদেশের মৌখিক ভাষাও সাহিত্যে চলবে না। কিন্তু চন্দ মহাশয়ের আসল আপত্তি ক্রিয়াপদের প্রচলিত বিভক্তিতে। তিনি বলেন, "আসছি" হচ্ছে ক্রিয়ার synthetic আকার, আর "আসিতেছি" তার analytic আকার; এবং যেহেতু বাংলাভাষা analytic ভাষা, সেই কারণ "আসিতেছি" আকারই গ্রাহ্য। এ যুক্তি যদি সঙ্গত হয়, তাহলে "আসতে আছি" লেখাই কর্ত্তব্য—কেননা "আসিতেছির" অপেক্ষা "আসতে আছি" analytic

হিসেবে আর এক ধাপ উপরে। প্রদেশভেদে আজও বাঙ্গালীর মুখে "আস্‌তে আছি" "আসিতেছি" এবং "আস্‌ছি", এই তিন রূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়; এবং কথায়বার্ত্তায় এর শেষোক্ত রূপটিই যে আমাদের কানে ভাল লাগে ও ভদ্র শোনায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং আমরা যদি কানের পরামর্শ শুনি, তাহলে লেখায় "আসিতেছি"র পরিবর্ত্তে "আসছি" লিখতে কুণ্ঠিত হব না। চন্দ মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে ইংরাজ-কবি মিলটনের যে মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন, তার একটি কথা আমি নতশিরে মেনে নিতে রাজি আছি। মিলটন বলেছেন, সাহিত্যের অন্তর থেকে বর্ব্বরতা দূর করবার জন্য "Detective police of ears"-এর প্রয়োজন। অলঙ্কারের সকল সমস্যা কেবলমাত্র নিরুক্ত ব্যাকরণের সাহায্যে মীমাংসা করা যায় না। এ ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষ করে আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, কোনও analytic ভাষা ষোল-আনা analytic নয়, কিন্তু অনেকাংশে বিভক্তিগত, অর্থাৎ synthetic.

(৫)

বাংলা পদ্য-সাহিত্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে চন্দ মহাশয় যা বলেছেন তা সত্য হলেও, উক্ত সাহিত্যের ভাষার প্রতি "সাধু" বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না,—ও গুণ হচ্ছে কলকাতার কেল্লাজাত গদ্যের একচেটে। কৃত্তিবাসী রামায়ণাদি গৌড়ের মুসলমান বাদশাদের আদেশে রচিত হলেও কোনও দরবারি ভাষায় রচিত হয় নি; খাঁটি বাংলা ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। এরূপ হবার কারণ চন্দ মহাশয় নিজেই নির্দ্দেশ করেছেন। তিনি বলেন:—

"ইংরেজ আমল আরম্ভ হইলে ইংরেজ রাজপুরুষগণকে বাঙ্গলা শিখাইবার জন্য গদ্যপুস্তকের দরকার হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে কোন পুরাণ গদ্যপুস্তক তখন ছিল না, যাহা সাহেবদিগকে পড়ান যাইতে পারিত। সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের হাতে বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্য তৈয়ারি করার ভার পড়িল। কৃত্তিবাস, গুণরাজখান, কবীন্দ্র, পরমেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিত হইলেও, তাঁহাদের গীত সাধারণ অশিক্ষিত লোকের জন্য রচিত হইয়াছিল।"

চন্দ মহাশয়ের উপরোক্ত কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য।—এ স্থলে অশিক্ষিত শব্দ সংস্কৃত-ভাষায় অনভিজ্ঞ লোকদের প্রতিই ব্যবহৃত হয়েছে, সুতরাং গৌড়ের পাঠান বাদশাদেরও নির্ভয়ে অশিক্ষিতের দলে ফেলা যেতে পারে। তাঁরা আরবি ফার্সিতে সুপণ্ডিত হলেও, নিশ্চয়ই সংস্কৃত জান্‌তেন না; নচেৎ সংস্কৃত কাব্যের বাংলা অনুবাদের জন্য তাঁরা অতটা লালায়িত হতেন না। ফোর্ট উইলিয়ামের সাহেবদের সঙ্গে তাঁদের একটি বিশেষ তফাৎ এই ছিল যে, সাহেবেরা বাংলা জানতেন না, বাদশারা জানতেন। কৃত্তিবাস প্রভৃতি কবিগণ রাজপুরুষদের বাংলা শেখাবার জন্য নয়, কাব্যকথা শোনাবার জন্য গ্রন্থ রচনা করেছিলেন,—কাজেই সে সব গ্রন্থ খাঁটি বাংলাতেই রচিত হয়েছে।—

চন্দ মহাশয় নবাবী আমলের পদ্যকে যে সাধু আখ্যা দেন, তার একমাত্র কারণ যে, বর্ত্তমান সাধু গদ্যের সঙ্গে সে পদ্যের এক জায়গায় মিল আছে। ক্রিয়ার অন্তে "ইয়া" এবং সর্ব্বনামের অন্তরে "হা" একালের গদ্যে আছে, এবং সেকালের পদ্যেও ছিল। বলা বাহুল্য ভাষা সম্বন্ধে সাধু শব্দের অর্থ হচ্ছে কেতাবি। কিন্তু এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, একালে ক্রিয়ার যে রূপ কেতাবি হয়ে উঠেছে, সেকালে সে

রূপ যে মৌখিক ছিল না, তার প্রমাণ কি? সেকালে তাঁরা যদি মুখে "করিয়া" না বল্‌তেন, তাহলে লেখায় ও রূপ কোথা থেকে আমদানি কর্‌লেন? একালে আমরা এ রূপের সন্ধান বইয়ের ভিতর পাই, কিন্তু বাংলার আদি কবিরা ত আর বাংলা বই প'ড়ে বাংলা বই লেখেন নি। সুতরাং এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সেকালের উচ্চারণের অনুরূপই বাংলা লিখে গিয়েছেন। বিশেষ্য ও বিশেষণের বেলায় তদ্ভবের পরিবর্ত্তে তৎসম শব্দ ব্যবহার করায় কোন বাধা ছিল না—কেননা সংস্কৃত অভিধানের মধ্যেই সে শব্দের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; কিন্তু ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামের সাধুবিভক্তির সন্ধান সংস্কৃত ব্যাকরণের ভিতর পাওয়া যায় না।—সুতরাং আমরা যখন "করে" লিখি, তখন বঙ্গ-সাহিত্যের মহাজনেরা যে পথে গিয়েছেন, সেই পথেরই অনুসরণ করি। চন্দ মহাশয় সাধুভাষার পক্ষে ওকালতি কর্‌তে বসেন নি—তিনি সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছেন; সুতরাং তিনি ভাষাসম্বন্ধে কোনও সত্যের সাক্ষাৎ পেলে, অকপটচিত্তে তা সকলের চোখের সুমুখে তুলে ধরেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত এই:—

"যদাদি সর্ব্বনামের যাহাকে যাহাতে ইত্যাদি রূপ; ইয়া, ইতেছি ইত্যাদি ক্রিয়ার বিভক্তি, অবশ্যই কথ্যভাষা ঝাড়িয়া পুছিয়াই সংগ্রহ করা হইয়াছিল।"—উক্ত বাক্যটি থেকে "ঝাড়িয়া পুছিয়া" পদ দুটি বাদ দিলে, আমার কথার সঙ্গে তাঁর কথার তিলমাত্রও প্রভেদ থাকে না। চন্দ মহাশয় আরও বলেন যে "এই সকল বিভক্তি যে কোন্ প্রদেশের কথ্যভাষা হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বলা সহজ নহে"।—আমার বিশ্বাস তা বলা মোটেই কঠিন নয়। গঙ্গা যেমন বাঙ্গলাদেশে প্রবেশ করামাত্র দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে, একদিকে পদ্মা আর একদিকে

ভাগীরথীর আকারে বয়ে গিয়েছে, বাংলা ভাষাও তেমনি দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে বয়ে চলেছে। মাহাত্ম্য যেমন পদ্মার জলে নেই, ভাগীরথীর জলে আছে,—তেমনি ভাগীরথীর উভয়কুলের বাংলা ভাষায় যে মাহাত্ম্য আছে, উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষার সে মাহাত্ম্য নেই। এই ভাগীরথী-ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা। আমরা যে ইংরাজি আমলের কেতাবি ভাষার বিরুদ্ধে কলম ধরেছি, তার কারণ—আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, কলকাতার কেল্লার গড়খাইয়ের বদ্ধ জলের পরিবর্ত্তে বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তরে আবার ভাগীরথীর প্রবাহ এনে ফেলা। এর উত্তরে যদি কেউ বলেন যে, সে জল ঘোলা—তার উত্তরে আমরা বলব তা হোক, ওতে স্রোত আছে।—কিন্তু সত্য কথা এই যে, এই ভাগীরথীভাষাই হচ্ছে আমাদের যথার্থ জীবন, এর স্নানপানেই আমরা কৃতার্থ হব। চন্দ মহাশয় তাঁর প্রবন্ধে লর্ড মরলির একটী মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। লর্ড মরলি বলেছেন যে, বর্ত্তমান ইংরাজি সাহিত্যে:—

"Domestic slang, scientific slang, pseudo-aesthetic affectations, hideous importations from American newspapers" প্রভৃতি প্রবেশ করে, সে সাহিত্যের শুদ্ধতা ও আভিজাত্য নষ্ট কর্‌ছে। বাঙ্গলার সাধু গদ্যের বিরুদ্ধে আমাদেরও ঐ একই অভিযোগ। বিদ্যে-দেখানো পণ্ডিতি slang, সৌন্দর্য্যের ওজুহাতে pseudo-aesthetic অর্থাৎ pseudo-classical affectations, ইংরেজি-ভাঙ্গা বীভৎস সঙ্কীর্ণবর্ণ নবশব্দ প্রভৃতির আমদানিতে বাঙ্গলার সাধুগদ্য কিম্ভূতকিমাকার ও জবড়জঙ্গ হয়ে উঠেছে।—চন্দ মহাশয়ের বিশ্বাস যে, আমরা সাহিত্যের ভাষা থেকে এ সব পাপ দূর করে, তার পরিবর্ত্তে domestic slang-এর আমদানি কর্‌তে চাই। তিনি

ভুলে গিয়েছেন যে, আমরা মৌখিক ভাষা ব্যবহার কর্‌তে চাই; সুতরাং যা ভদ্রলোকের মুখে চলে না, এমন কোনও শব্দ সাহিত্যে স্থান দেবার পক্ষপাতী আমরা কখনই হতে পারি নে। Slang, ভাষা নয়; হয় তা অপভাষা, নয় উপভাষা। ও বস্তু হচ্ছে একদিকে মৌখিক ভাষার বিকার, আর একদিকে বিদ্যার কারখানার সাঁটে-কথা।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, আমরা বাংলা ভাষাকে শুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটি-ভাবে ব্যবহার কর্‌তে চাই।—ভাষার শুদ্ধতা কাকে বলে, তা চন্দ মহাশয়ধৃত বাগ্‌ভটালঙ্কারের একটি বচনে বেশ স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়েছে।—

"অপভ্রংশস্তু যচ্ছুদ্ধং তত্তদ্দেশেষু ভাষিতম"

অর্থাৎ "সেই সেই দেশে কথিত ভাষা সেই সেই দেশের বিশুদ্ধ অপভ্রংশ।"—

চন্দ মহাশয় প্রমাণ করেছেন যে, বাংলা একটী অপভ্রংশ; সুতরাং কথিত ভাষা যে শুদ্ধ বাংলা—এ কথা তিনি অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না। এবং এই ভাষাই যে সাহিত্যে প্রযুজ্য, সে সম্বন্ধে তিনি ভরত মুনির বিধিও উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। সে বিধি এই ঃ—

বিন্ধ্যসাগর-মধ্যে তু যে দেশাঃ শ্রুতিমাগতাঃ।
ন-কার বহুলা তেষু ভাষা তজ্জ্ঞঃ প্রয়োজয়েৎ॥—

আমরা এই শাস্ত্রবিধি পালন কর্‌বার চেষ্টা করে থাকি। আমাদের এ প্রচেষ্টা যে শুধু শাস্ত্রসঙ্গত তাই নয়—যুক্তিসঙ্গতও বটে। চন্দ মহাশয় এই বলে তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন ঃ—

"খাঁটি বাঙ্গলা শিক্ষা করা আবশ্যক"।—আমরা বলি শুধু শিক্ষা নয়, এ বিষয়ে দীক্ষা নেওয়াও আবশ্যক।—চন্দ মহাশয় সাহিত্যের

ভাষা সম্বন্ধে লর্ড মরলির মত উদ্ধৃত করে দিয়েছেন। লর্ড মরলির চাইতে ঢের বড় লেখক—নব্য ইতালির সর্ব্বপ্রধান কবি ও গদ্যলেখক Carducci-র মত আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। Bologna বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বোধন করে Carducci তাঁর শেষ বয়সে এই কটি কথা বলেন। ঃ—

"It has been my wish always to inspire myself and lift you up to the attainment of this ideal—to shed the old garments of an outworn state of society, and to prefer being to seeming, duty to pleasure; to aim high in art, I say; at simplicity rather than artifice; at grace rather than mannerism; at vigour rather than display; at truth and justice rather than glory."—

আমাদের সরস্বতীর মন্দিরের সিংহদ্বারের উপরে এই কটি কথা যে সোণার অক্ষরে লিখে রাখা উচিত—এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস চন্দ মহাশয় আমার সঙ্গে একমত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অহল্যা।

—:০:—

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাং স্মরেন্নিত্যং সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥

উক্ত বিধির অর্থ ও অভিপ্রায় নিয়ে বহু শিক্ষিত লোক যে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। ইংরাজি শিক্ষার গুণ কিম্বা দোষই এই যে, তা মানুষকে মানুষের সকল কথা, সকল কাজের মানে বুঝতে ও কারণ খুঁজতে শেখায়; এবং বলা বাহুল্য যে উক্ত বিধির মর্ম্ম ও ধর্ম্ম এতটা প্রত্যক্ষ নয় যে, বিনা অনুসন্ধানে বিনা গবেষণায় তা হস্তগত করা যায়।

কিন্তু অনেক মাথা বকিয়েও, স্মৃতিশক্তির উক্তরূপ চর্চ্চার সার্থকতা,—এক কথায় এ বিধির বৈধতা—কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি। এর প্রথম কারণ, বুদ্ধির ছুরিতে চিরে দেখলে দেখা যায় যে, অনেক বিধিরই অন্তরে কোনও সার নেই। এর দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই বিধিটি এতই বেখাপ্পা ও বেয়াড়া যে এর কাছ থেকে আমাদের সামাজিক সংস্কার ঘা খেয়ে এবং বিচারবুদ্ধি হার মেনে চলে আসে। সাদার গালে কালি দিয়ে তাকে কালো করা যত সহজ, কালোর গালে চুন দিয়ে তাকে সাদা করা তত সহজ নয়। সে চূর্ণ যে ছুঁলে মুছে যায়, তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যায়।

এ বিধির অর্থ উদ্ধার করবার চেষ্টাটা একদম বাজে খাটুনি;—কেননা আমার বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে আমাদের কোনও পৈতৃক আধ্যাত্মিক গুপ্ত ধন পোঁতা নেই। যে দেশে সীতা সাবিত্রী চিরস্মরণীয়া, সেই দেশেই যে আবার তারা মন্দোদরী নিত্যস্মরণীয়া—এ কথা এতই অদ্ভুত যে, উক্ত শ্লোকটি উদ্ভট না হয়ে যায় না। ও হচ্ছে আসলে একটা রসিকতা—এবং বেজায় রসিকতা।

রসিকতাকে যে লোকে হয় অসার কথা নয় সার কথা বলে ভুল করে, তার পরিচয় ত একালেও সকালে বিকেলে পাওয়া যায়। সেকালের তাঁরা একালের আমাদের চাইতে যখন ঢের বেশী গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, তখন সেকালের রসিকতা যে কালগুণে শাস্ত্রবিধি হয়ে উঠবে, তাতে আর আটক কি?

(২)

এককালের রসিকতা যে আর এককালে বিধি হিসেবে গণ্য হতে পারে, একথা অনেকে মানলেও,—একথা সকলে মানবেন না যে, এককালের বিধি আর এক কালে রসিকতা হিসেবে গণ্য হতে পারে। যার কোনও কারণ নেই, মীমাংসক মতে সেই বিধিই যে একমাত্র পাকা বিধি, এ কথা কে না জানে?—সুতরাং উক্ত নিয়মানুসারে এ বচনকে পাকা বিধি বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য হলেও, এর একটা কথায় মনের মধ্যে একটু খট্‌কা রয়ে যায়।

কথাটা হচ্ছে এই যে, অহল্যাকে দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরীর দলে কেন ফেলা হল? এঁরা হচ্ছেন সব রাজার মেয়ে, রাজার রাণী,

সব এক জাত, এক দল। অপরপক্ষে অহল্যা ছিলেন একে ব্রাহ্মণ-কন্যা, তাতে ঋষিপত্নী; অপর চারটির সঙ্গে তিনি ত এক কেলাসে বসতেই পারেন না।

কথায় বলে, "রাজার নন্দিনী প্যারী যা কর তা শোভা পায়।"

সুতরাং ইহজীবনে উক্ত রাজার নন্দিনীরা যে যা করেছিলেন, সে সবই যে শোভা পেয়েছিল,—তার সাক্ষী ব্যাস ও বাল্মীকি। এই রাজার ঝিরা আখেরে রাজার প্যারী হয়েই ভবলীলা সম্বরণ করে' স্বর্গে গিয়েছিলেন। দ্রৌপদী অবশ্য স্বর্গের সকল সিঁড়ি ভাঙ্গতে পারেন নি, তার কারণ তিনি হাতের পাঁচটি আঙ্গুলকে সমান করে দেখেন নি। সশরীরে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল শুধু বেচারি ব্রাহ্মণকন্যাকে; আর সে প্রায়শ্চিত্ত কি ভয়ানক কাণ্ড—দেহ হয়ে গেল পাষাণ, আর তার ভিতর আত্মা রইল কবরস্থ। নিজের ভিতর নিজের গোর হওয়াটা কখনই আরামের হতে পারে না,—হোক না সে সমাধি-মন্দির মার্বেল পাথরে গড়া। অথচ কি অপরাধে তাঁকে এই কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল?—অহল্যার অপরাধ এই যে, তিনি সরল বিশ্বাসে দেবতাকে স্বামী বলে ভুল করেছিলেন। স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করায় যে পুণ্য হয়, এ কথা ত এদেশের স্ত্রীলোকেও জানে; অথচ এ কথা এ দেশের পুরুষেও মানে যে, অধিকাংশ স্ত্রীর পক্ষে অধিকাংশ স্বামীকে দেবতা বলে ভুল করবার কোনও কারণ নেই,—অতএব সে ভুল করাও অসম্ভব। সুতরাং দাঁড়াল এই যে, যে ভুল করা অসম্ভব সেই ভুল করায় হয় মহাপুণ্য,—আর যে ভুল না করা অসম্ভব, সেই ভুল করায় হয় মহাপাপ। দর্শনে বলে এ জগৎটা একটা ভ্রান্তি মাত্র।

জীবনের গোড়ার অঙ্কই যখন ভুল, তখন তার ভুলের অঙ্ক যত বাড়ানো যাবে জীবনটা যে তত বড় হয়ে উঠবে—এ ত ধরা কথা। এই কারণেই সামাজিক পিনাল কোডের ধারাগুলি মুখস্থ করেই লোকে জীবনে পাশ হয়,—বুঝলে পরে নির্ঘাত ফেল।

(৩)

অতএব ধরে নেওয়া যাক্ যে, অহল্যা তার পাপের উপযুক্ত শাস্তিই ভোগ করেছিল।

তারপর এই প্রশ্ন ওঠে যে, একবার যে পাষাণী হয়েছিল, তাকে আবার মানবী করারূপ দ্বিতীয়বার শাস্তি দেবার কি সঙ্গত কারণ ছিল। মানুষকে যখন মরতেই হবে, তখন একবার এবং একেবারে মরাই ভাল। রামচন্দ্রের পাদস্পর্শে অহল্যা বেঁচে উঠে আবার যে-কি-সেই হয়েছিলেন,—অমরত্ব লাভ করেন নি। রামায়ণে শুধু এক ব্যক্তি অমর হন; এবং তাঁর নাম বিভীষণ—এরূপ হবার কারণ এই যে, পৃথিবীতে অমরত্ব একটা বিভীষিকা মাত্র। অতএব এ কথা নিঃসন্দেহ যে, অহল্যা বেচারিকে দোকর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিয়ে, রামচন্দ্র তাঁর বিশেষ কোন উপকার করেন নি; মাঝ থেকে দেশের একটি মহা ক্ষতি করে গিয়েছেন। পাষাণী অহল্যা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণের সঞ্জীবনী-স্পর্শ না পেলে, এদেশে এমন একটি Statue থেকে যেত, যার রূপের তুলনা মর্ত্যে ত দূরে থাক অমরাপুরীতেও নেই। তাহলে গ্রীসের দেবীমূর্ত্তির উপর ভারতবর্ষের মানবীমূর্ত্তি টেক্কা দিতে পারত। শুধু তাই নয়—আর্ট realistic কি idealistic—এ পণ্ডিতী তর্কটাও

উঠত না। কেননা আমরা ঐ নমুনা চোখের সুমুখে রেখে সেই আর্টের চর্চ্চা করতুম—যা একাধারে ও দুইই। যা পরম সুন্দর তা যে ভগবানের সৃষ্টি,—এই পরম সত্যের সাক্ষাৎ আমরা চর্ম্ম-চক্ষেই লাভ করতে পারতুম।

৩০শে বৈশাখ।

বীরবল।

দুখানি চিঠি।

—:০:—

(চিঠি লেখাটা একালের এবং বিশেষ করে ইউরোপের সামাজিক রীতি। এর কারণও স্পষ্ট;—পোষ্ট আফিসের সৃষ্টির পূর্ব্বে একখানি চিঠি পাঠাতে যে অর্থ-ব্যয় হত, তাতে একালে ইহজীবনের মত ডাকটিকিট কেনা যায়। সংস্কৃত-সাহিত্য খুঁজেপেতে আমি দুখানি মাত্র "লেখ্যর" সন্ধান পেয়েছি। একখানি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রে, আর একখানি দামোদর গুপ্তের এমন একখানি স্বনামধন্য কাব্যে, যার নাম উল্লেখ করতে সঙ্কোচ বোধ হয়। বারান্তরে এই চিঠি দুখানি মায় বঙ্গানুবাদ পাঠক সমাজের নিকট পেশ করব। এই নমুনা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেকালে চিঠি লেখা ব্যাপারটা অতি সংক্ষেপেই সারা হত,—সম্ভবতঃ এই কারণে যে, সে যুগে কাগজেরও বিশেষ অনটন ছিল।

এই পোষ্ট আপিসের যুগেই চিঠি লেখাটা যে সর্ব্বসাধারণের করস্ত হয়েছে, শুধু তাই নয়—কারও কারও হাতে তা একটা বিশেষ আর্ট হয়ে উঠেছে। ইউরোপের অনেক বড় লেখকের চিঠি সাহিত্যেরই একটা অঙ্গ। উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজ কবি Byron, জর্ম্মাণ কবি Heine, এবং ফরাসি নভেলিষ্ট Flaubert-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। পত্রসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আসন এঁদের কারও চাইতে নীচে নয়। এই বিশ্বাসের বলেই আমি তাঁর বহুকাল-পূর্ব্বে লেখা দুখানি চিঠি প্রকাশ করছি। বলা বাহুল্য এ ধরণের চিঠি ব্যক্তি-বিশেষকে লেখা হলেও তা সাধারণের সম্পত্তি। এ চিঠি দুখানির একটু বিশেষ মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়েসের "ছবি ও গান" ও "মেঘদূত" কি অবস্থায় ও কি মনোভাব থেকে লিখিত, এই চিঠি দুটিতে পাঠক তার পরিচয় পাবেন।—শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।)

(১)

শান্তিনিকেতন
বোলপুর।
২১ মে, ১৮৯০।

প্রমথ

আমি কিছুদিন থেকে তোমাকে লিখ্‌ব লিখ্‌ব করছিলুম। তুমি চুয়োডাঙ্গায় যাবার পর থেকেই তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ভারি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেনার দায়ে একদিন সকালবেলা হঠাৎ বাড়ির গ্যাস-পাইপ এবং জলের পাইপ কেটে দিয়ে গেলে যেমন দশা হয়—কতকটা সেইরকম। পৃথিবীতে বড় বড় মহাত্মাদের কল্যাণে অনেক বড় বড় সরোবর আছে, এবং সেখানে স্নান করে পান করে ভাবের তৃষা সম্পূর্ণ নিবারণ করা যায়; কিন্তু একেবারে ঘরের ভিতরে হাতের কাছে কথোপকথনের নলের ভিতর দিয়ে যে জলের সঞ্চার হয়, তার মধ্যে যদিও সাঁতার দেওয়া, ডুব দেওয়া বা আত্মহত্যা করা যায় না, কিন্তু দৈনিক সহস্র সুবিধের পক্ষে সেটি বড় আবশ্যকীয় জিনিস। কেবল কথোপকথন নয়,—খবরের কাগজ, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রভৃতি ক্ষণিক সাহিত্য এইরকম জলের কলের কাজ করে; তারা পূর্ব্বোক্ত ভাবসরোবর থেকে জল আকর্ষণ করে' অল্প মূল্যে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে বিতরণ করে, এইজন্যে বোধ করি অনেক আধুনিক পাঠক সন্তরণ এবং নিমজ্জন সুখ একেবারে বিস্মৃত হয়েছে—কারণ নলের মধ্যে আর সব পাওয়া যায়, কিন্তু সরোবরের উদারতা এবং অতলতা তার মধ্যে প্রবেশ করে না। উপস্থিত প্রসঙ্গে এত কথা বলবার কোন আবশ্যক ছিল না—কিন্তু উপমাটা নাকি এল, সেই জন্যে সেটিকে নিঃশেষ করে চুকিয়ে দেওয়া গেল—অপ্রাসঙ্গিক হলেও "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও!"

তোমার সম্বন্ধে যা বলবার, অলঙ্কার না দিয়ে ঠিক সেইটুকু বল্‌তে গেলে আধখানি পাতও পোরে না;—সংক্ষেপে, তোমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বেশ চল্‌ছিল ভাল—হঠাৎ বন্ধ হয়ে একটু যেন বিপদে পড়েছিলুম; তোমার চিঠি পেয়ে আবার কলে জল এল। খানিকটা যা' তা' বকা-বকি করে বাঁচা যাবে। কিন্তু মুখোমুখি বসে আকার ইঙ্গিত এবং কণ্ঠস্বর-যোগে অবিচ্ছিন্ন আলোচনার মধ্যে যে একটি উত্তাপ আছে, চিঠিতে সেটি পাওয়া যায় না,—সেই উত্তাপে দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনের মধ্যে অনেক ভাবের অঙ্কুর বেরিয়ে পড়ে; অবিশ্যি, সেগুলো সব যে টিঁকে যায় তা নয়—অধিকাংশ দ্রুত প্রকাশের স্বভাবই হচ্চে দ্রুত বিনাশ। কিন্তু এতে মানসিক জীবনের যে একটা চর্চ্চা হয়, সেটা ভারি আনন্দের এবং কাজেরও। অতএব দিনকতকের জন্যে যদি বোলপুরে আস্‌তে পার, তাহলে মাঝে মাঝে নানা কথা বলা কওয়ার অবসর ঘটতে পারবে। এখানে যেই বহুবিধ আছে; এখানকার একটা ছোটখাট লাইব্রেরি আছে, তা ছাড়া আমিও কিছু বই সঙ্গে এনেছি। এখেনে গদি-দেওয়া চৌকি, নরম কৌচ, চিৎ হয়ে শোবার এবং ঠেসান দিয়ে বসবার বিবিধ সরঞ্জাম আছে। অতএব এখেনে শারীরিক এবং মানসিক স্বাধীনতার কোনরকম ব্যাঘাত ঘটবে না। তুমি চুয়োডাঙ্গার যেরকম বর্ণনা করেছ, তার সঙ্গে বোলপুরের "প্রাকৃতিক ভূগোলের" অনেক সাদৃশ্য আছে। চারদিকে মাঠ ধূ ধূ করচে—মাঝে মাঝে এক একটা বাঁধ, এবং তার উঁচু পাড়ের উপর শ্রেণীবদ্ধ তালবন—মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে আকাশ একেবারে অনাবৃত ভূমিতলকে স্পর্শ করে রয়েছে—মাঠের পশ্চিম প্রান্তে ঘন বনের রেখা দেখা যায়। মধ্যেকার এই মরুক্ষেত্র অনশনশীর্ণ পাণ্ডুবর্ণ তৃণে

আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে এক একটা নিতান্ত খর্ব্বাকার খেজুরের ঝোপ—মাঝে মাঝে মাটি দগ্ধ হয়ে, কালো হয়ে, কঠিন হয়ে পৃথিবীর কঙ্কালের মত বেরিয়ে রয়েছে। উত্তর দিকের মাঠ বর্ষার জলস্রোতে নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে লিলিপট্‌দেশীয় ক্ষুদ্রকায় গিরিশ্রেণীর আকার ধারণ করেছে—সেই ছোট ছোট রক্তবর্ণ কঠিন মৃত্তিকার স্তূপ নানা রকম পাথরের টুকরো ও কাঁকরে আবৃত—তাতে ছোট ছোট বুনো জাম, বেঁটে খেজুর এবং অখ্যাতনামা দুই এক রকমের গুল্ম অত্যন্ত বিরল ভাবে শোভা পাচ্চে—তারি মধ্যে মধ্যে ঝরনা এবং জলস্রোতের শুষ্ক রেখা দেখা যায়—শরৎকালে সেইগুলো পূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং ছোট ছোট মাছ তাতে খেলা করে। এই মরুভূমির মাঝখানে আমাদের বাগানটি গাছে ছায়ায় ফলে ফুলে আচ্ছন্ন হয়ে, পাখীর গানে মুখরিত হয়ে, তরুপল্লবের-অন্তরাল-হতে-দৃশ্যাগ্রশিখর প্রাসাদের দ্বারা মুকুটিত হয়ে, নিভৃত মহিমায় বিরাজ করচে। এই বোলপুরের বাগান আমাদের ভারি ভাল লাগে। ছেলেবেলায় আরো ভাল লাগ্‌ত। বোধ হয় এখনকার ভাল লাগার মধ্যে তারি সেই "রেশ" রয়ে গেছে।

আমার "ছবি ও গান" আমি যে কি মাতাল হয়ে লিখেছিলুম, তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ, এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভবও করচ। আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে, তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখ্‌তে ত মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্ষেপামি দেখিয়ে বেড়াচ্চে। আমার সমস্ত শরীরে মনে নব যৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে,

পড়েছিল। আমি জান্‌তুম না আমি কোথায় যাচ্চি, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চে। একটা বাতাসের হিল্লোলে এক রাত্রির মধ্যে কতকগুলো ফুল মায়ামন্ত্রবলে ফুটে উঠেছিল, তার মধ্যে ফলের লক্ষণ কিছু ছিল না। কেবলি একটা সৌন্দর্য্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছুই ছিল না। তোমাদেরও বোধহয় এ রকম অবস্থা হয়—

"উড়িতেছে কেশ, উড়িতেছে বেশ,
উদাস পরাণ কোথা নিরুদ্দেশ,
হাতে লয়ে বাঁশি, মুখে লয়ে হাসি,
ভ্রমিতেছি আনমনে—
চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবনমুকুল প্রাণে বিকশিত,
সৌরভ তাহার বাহিরে আসিয়া
রটিতেছে বনে বনে।"

সত্যি কথা বল্‌তে কি, সেই নব যৌবনের নেশা এখনো আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। "ছবি ও গান" পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, এমন আমার কোন পুরোণো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝতে পারি সে নেশা এখনো এক জায়গায় আছে—তবে কিনা, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep-delved 'heart'.

আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্য্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্য্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যা-

ত্মিকজাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিকজাতীয়, সাকারে জড়িত। একটা হচ্চে Shelley-র Skylark, আর একটা হচ্চে Wordsworthএর Skylark। একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার, এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে, সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্য্য-ব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে,—অপূর্ণ এবং পূর্ণ—যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা অধিক অনুভব করে (এইজন্যে তারা যা'কে তা'কে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে)—পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে, এইজন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল, কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচে না। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাকলেই ভাল হয়, কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ। না, ঠিক দুর্লভ বলা যায় না—ভাল কবিমাত্রেরই মধ্যে সেই সামঞ্জস্য আছে—নইলে ঠিক কবিতাই হয় না। অসম্পূর্ণ Real এবং পরিপূর্ণ Idealএর মিলনই কবিতার সৌন্দর্য্য। কল্পনার Centrifugal force Idealএর দিকে Real-কে নিয়ে যায়, এবং অনুরাগের Centripetal force Realএর দিকে Ideal-কে আকর্ষণ করে—কাব্যসৃষ্টি নিতান্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যায় না, এবং নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হয়ে কঠিন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। তুমি ঠিক বলেছ—"আর্ত্তস্বর" এবং "রাহুর প্রেম" "ছবি ও গানের" মধ্যে

অসঙ্গত হয়েছে, এদের মধ্যে যে একটা তীব্রতা আছে অন্যান্য গানের মধুরতার সঙ্গে তার অনৈক্য হয়েছে। আরেকটা কবিতা আছে সেটা আর এক রকমে অসঙ্গত—যথা "পোড়ো বাড়ি।"

সময় এবং স্থান সংক্ষেপ হয়ে আসচে। আজ এইখানেই ইতি করা যাক্। আজকাল একটু আধটু লিখতে আরম্ভ করেছি—কাছে থাকলে টাট্‌কা টাট্‌কা শোনাতুম।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(২)

২৪ মে, ১৮৯০।

প্রমথ

অনেকগুলি অপরিচিতাক্ষর পাতলা চিঠির মধ্যে চুয়োডাঙ্গা মুদ্রাঙ্কিত একখানি বেশ মোটা মজবুৎ ভারিগোছের চিঠি পেয়ে লাগ্‌ল ভাল। কাল সকালবেলায় একটা লেখা এবং রাত্তিরে একটা বই শেষ করে আজ প্রাতঃকালে নিতান্ত অকর্ম্মণ্যভাবে বসে ছিলুম—ঠিক সময়ে চিঠি পাওয়া গেল—এখন শরীরমন আবার একটু সচেতন হয়ে উঠেছে।

এখানে আজকাল খুব ঝড়বৃষ্টি বাদলের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। এ জায়গাটা ঠিক ঝড়বৃষ্টির উপযুক্ত। সমস্ত আকাশময় মেঘ করে, অর্থাৎ সমস্ত আকাশটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, ঝড় সমস্ত মাঠটাকে আপনার হাতে পায়—বৃষ্টি মাঠের উপর দিয়ে চলে চলে আসে, দূরে থেকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখা যায়। বর্ষার অন্ধকার ছায়াটাকে আপনার চতুর্দ্দিকে প্রকাণ্ডভাবে বিস্তৃত দেখ্‌তে পাওয়া যায়। খুব দূর থেকে

হুহুঃশব্দ করতে করতে, ধুলো,—শুক্‌নো পাতা এবং ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্তূপাকার মেঘ উড়িয়ে নিয়ে, অকস্মাৎ আমাদের এই বাগানের উপর মস্ত একটা ঝড় এসে পড়ে—তার পরে, বড় বড় গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে যে নাড়া দিতে থাকে—সে এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। ফলে পরিপূর্ণ আমগাছ তার সমস্ত ডালপালা নিয়ে ভূমিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ে—কেবল শালগাছগুলো বরাবর খাড়া দাঁড়িয়ে আগাগোড়া থর্‌থর্ করে কাঁপতে থাকে। মাঠের মাঝখানে আমাদের বাড়ি—সুতরাং চতুর্দ্দিকের ঝড় এরি উপরে এসে পড়ে ঘুর্‌পাক খেতে থাকে; সেদিন ত একটা দরজা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙ্গে আমাদের ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত—যে কাণ্ডটা করলেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল অরণ্যই এঁর উপযুক্ত স্থান—ভদ্রলোকের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার মত সহবৎ শিক্ষা হয় নি; অবিশ্যি, কার্ড পাঠিয়ে ঢোকা প্রভৃতি নব্যরীতি এঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করাই যেতে পারে না, কিন্তু ভিজে পায়ে ঢুকে গৃহস্থ ঘরের জিনিসপত্র সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দেওয়াই কি সনাতন প্রথা? কিন্তু এ রকম অশিষ্টাচরণ সত্বেও লেগেছিল ভাল। বহুকাল এরকম রীতিমত ঝড় দেখি নি। এখানকার লাইব্রেরীতে একখানা মেঘদূত আছে; ঝড়বৃষ্টিদুর্য্যোগে, রুদ্ধদ্বারগৃহপ্রান্তে তাকিয়া আশ্রয় করে দীর্ঘ অপরাহ্নে সেইটি সুর করে করে পড়া গেছে—কেবল পড়া নয়—সেটার উপরে ইনিয়ে বিনিয়ে বর্ষার উপযোগী একটা কবিতা লিখেও ফেলেছি। মেঘদূত পড়ে কি মনে হচ্ছিল জান? বইটা বিরহীদের জন্যেই লেখা বটে—কিন্তু এর মধ্যে আসলে বিরহের বিলাপ খুব অল্পই আছে—অথচ সমস্ত ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। বিরহাবস্থার মধ্যে একটা বন্দীভাব আছে কি না—এই

জন্যে বাধাহীন আকাশের মধ্যে মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপ-গ্রস্ত যক্ষ আপনার দুরন্ত আকাঙ্ক্ষাকে তারি উপরে আরোপন করে বিচিত্র নদী, পর্ব্বত, বন, গ্রাম, নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার সুখ উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে ভেসে চলেছে। মেঘদূত কাব্যটা সেই বন্দী হৃদয়ের বিশ্বভ্রমণ। অবশ্য, নিরুদ্দেশ্য ভ্রমণ নয়—সমস্ত ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাঙ্ক্ষার ধন আছে—সেইখানে চরম বিশ্রাম—সেই একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য দূরে না থাক্‌লে এই লক্ষ্যহীন ভ্রমণ অত্যন্ত শ্রান্তি ও ঔদাস্যের কারণ হত। কিন্তু সেখানে যাবার তাড়াতাড়ি নেই—রয়ে বসে আপনার স্বাধীনতা-সুখ সম্পূর্ণ উপভোগ করে, পথিমধ্যস্থিত বিচিত্র সৌন্দর্য্যের কোনটিকেই অনাদরে উল্লঙ্ঘন না করে, রীতিমত Oriental রাজ-মাহাত্ম্যে যাওয়া যাচ্চে। যক্ষের দিক থেকে দেখতে গেলে সেটা হয়ত ঠিক "ড্রামাটিক্" হয় না—একটা দক্ষিণে ঝড় উঠিয়ে একেবারে হুস্ ক'রে সেখানে গিয়ে পড়লেই বোধহয় তার পক্ষে ঠিক হত—কিন্তু তাহলে পাঠকদের অবস্থা কি হত বল দেখি? আমরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বন্ধ হয়ে আছি—মনটা উদাস হয়ে আছে,—আমাদের একবার মেঘের মত মহা স্বাধীনতা না দিলে অলকাপুরীর অতুল ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা কি তেমন ভাল লাগ্‌ত! আজ বর্ষার দিনে মনে হচ্চে পৃথিবীর কাজকর্ম্ম সমস্ত রহিত হয়ে গেছে, কালের মস্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চল্‌চে না—তবুও আমি বন্ধ হয়ে আছি, ছুটি পাচ্চি নে! আজ এই কর্ম্মহীন আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনে পৃথিবীর সমস্ত অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের মধ্যে বেরিয়ে পড়লে বেশ হয়—আজ ত আর কোন দায়িত্বের কাজ কিছুই নেই—সংসারের সহস্র ছোটখাট কর্ত্তব্য

আজকের এই মহা দুর্য্যোগে স্থানচ্যুত হয়ে অদৃশ্য হয়েছে—আজ তেমন সুযোগ থাকলে কে ধরে রাখতে পারত? যে সকল নদীগিরি নগরীর সুন্দর বহুপ্রাচীন নাম বহুকাল থেকে শোনা যায়, মেঘের উপরে বসে সেগুলো দেখে আসতুম। বাস্তবিক কি সুন্দর নাম! নাম শুন্‌লেই টের পাওয়া যায় কত ভালবেসে এই নামগুলি রাখা হয়েছিল, এবং এই নামগুলির মধ্যে কেমন একটি শ্রী ও গাম্ভীর্য্য আছে! রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী, গম্ভীরা, নির্ব্বিন্ধ্যা;—চিত্রকূট, আম্রকূট, বিন্ধ্য; দশার্ণ, বিদিশা, অবন্তী, উজ্জয়িনী; এদেরই সকলের উপরে নব বর্ষার মেঘ উঠেছে, এদেরই যূথীবনে বৃষ্টি পড়চে, এবং জনপদবধূরা কৃষিফলের প্রত্যাশায় স্নিগ্ধনেত্রে মেঘের দিকে চাচ্চে। এদের জম্বুকুঞ্জের ফল পেকে আকাশের মেঘের মত কালো হয়ে উঠেছে—দশার্ণ গ্রামের চতুর্দ্দিকে কেয়াগাছের বেড়াগুলিতে ফুল ধরেছে—সেই ফুলগুলির মুখ সবে একটুখানি খুল্‌তে আরম্ভ করেছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে উজ্জয়িনীর গৃহস্থঘরের ছাদের নীচে পায়রাগুলি সমস্ত ঘুমিয়ে রয়েছে—রাজপথের অন্ধকার এম্‌নি প্রগাঢ় যে, সূচি দিয়ে ভেদ করা যায়। কবির প্রসাদে আজকের দিনে যদি মেঘের রথ পাওয়াই গেল, তাহলে এ সব দেশ না দেখে কি যাওয়া যায়? যক্ষের যদি এতই তাড়া ছিল, তাহলে ঝোড়ো বাতাসকে কিম্বা বিদ্যুৎকে দূত করলেই ঠিক হত—যক্ষ যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর হয়, তাহলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ করা যেতে পারে। সেকালের দিনে যদি এখনকার মত তীক্ষ্ণদর্শী ক্রিটিক্ সম্প্রদায় থাক্‌ত, তাহলে কালিদাসকে মহা জবাবদিহিতে পড়তে হত—তাহলে এই ক্ষুদ্র সোনার তরীটি লিরিক্, ড্রামাটিক্, ডেস্‌ক্রিপ্টিভ্, প্যাস্টোরাল প্রভৃতি

ক্রিটিক্‌দের কোন্ পাহাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা যায় না। আমি এই কথা বলি, যক্ষের পক্ষে কবির আচরণ যেমনি হোক্, আমার পক্ষে ভারি সুবিধে হয়েছে—ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বল্‌চি, dramatic হয় নি,—কিন্তু আমার বেশ লাগ্‌চে। আমার আর একটা কথা মনে পড়চে—যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল, সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশ দেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস কর্‌ত, তাদেরও ত বিরহব্যথা ছিল—এইজন্যে অলকা যদিও মেঘের terminus, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্ত্তী ষ্টেষনে এই সকল বিরহী হৃদয়দের নাবিয়ে দিয়ে যেতে হয়েছিল। সে সময়কার নানা বিরহকে নানা দেশ বিদেশে পাঠাতে হয়েছিল, তাই জন্যে অলকায় পৌঁছতে একটু দেরি হয়েছিল—এজন্যে হতভাগ্য যক্ষের এবং তদপেক্ষা হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবির সমুচিত apology করা হয় নি—কিন্তু সেটাকে তাঁরা যদি public grievance বলে ধরেন, তাহলে ভারি ভুল করা হয়। আমি ত বল্‌তে পারি আমি এতে খুসি আছি। বর্ষাকালে সকল লোকেরই কিছু না কিছু বিরহের দশা উপস্থিত হয়—এমন কি প্রণয়িণী কাছে থাক্‌লেও হয়—কবি নিজেই লিখেছেন—

"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষে প্রণয়িণীজনে, কিং পুনর্দূর সংস্থে!"

অর্থাৎ মেঘলা দিনে প্রণয়িণী গলায় লেগে থাক্‌লেও সুখী লোকের মন উদাসীন হয়ে যায়—দূরে থাক্‌লে ত কথাই নেই! অতএব কবিকে বর্ষার দিনে এই জগদ্ব্যাপী বিরহীমণ্ডলীকে সান্ত্বনা দিতে হবে—কেবল ক্রিটিক্‌কে না। এই বর্ষার অপরাহ্নে ক্ষুদ্র আত্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দর্য্যের স্বাধীনতাক্ষেত্রে মুক্তি দিতে

হবে—আজকের সমস্ত সংসার দুর্যোগের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে, অন্ধকার হয়ে, বিষণ্ণ হয়ে বসে আছে। মেঘদূত পড়তে পড়তে আর একটা চিন্তা মনে উদয় হয়। সেকালেই বাস্তবিক বিরহী বিরহিণী ছিল, এখন আর নেই। পথিকবধূদের কথা কাব্যে পড়া যায়, কিন্তু তাদের প্রকৃত অবস্থা আমরা ঠিক অনুভব কর্ত্তে পারি নে। পোষ্ট অফিস এবং রেলগাড়ি এসে দেশ থেকে বিরহ তাড়িয়েছে। এখন ত আর প্রবাস বলে কিছু নেই—তাই জন্যে বিরহিণীরা আর কেশ এলিয়ে, আর্দ্র তন্ত্রী বীণা কোলে করে ভূমিতলে পড়ে থাকেন না। ডেস্কের সাম্‌নে বসে চিঠি লিখে, মুড়ে, টিকিট লাগিয়ে ডাকঘরে পাঠিয়ে দিয়ে, তার পরে নিশ্চিন্ত মনেস্নানাহার করেন। এমন কি, ইংরাজ রাজত্বেও কিছুদিন পূর্ব্বে যখন ভালরূপ রাস্তাঘাট যানবাহনাদি ও পুলিশের বন্দোবস্ত হয় নি, তখনো প্রবাস বলে একটা সত্যিকার জিনিস ছিল—তাই

"প্রবাসে যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না!"—

কবিদের এ সকল গানের মধ্যে এতটা করুণা প্রবেশ করেছিল। তুমি মনে করোনা আমি এতদূর নির্লজ্জ কৃতঘ্ন যে, চিঠির মধ্যেই পোষ্ট্ অফিসের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করচি! আমি পোষ্ট্ অফিসের বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্বীকার করচি যে, যখন মেঘদূত বা কোন প্রাচীন কাব্যে বিরহিণীর কথা পড়ি—তখন মনের মধ্যে ইচ্ছে করে ঐরকম সত্যিকার বিরহিণী আমার জন্যে যদি কোন প্রবাসে বিরহশয়ানে বিলীন হয়ে থাকে, এবং আমি যদি জড় অথবা চেতন কোন দূতের সাহায্যে অথবা কল্পনার প্রভাবে সেটা জান্‌তে পারি—তাহলে বেশ হয়! স্বদেশেই থাক্, বিদেশেই থাক্, এবং ভালবাসা যেমনই থাক্—

সকলেই বেশ comfortably কাল যাপন করচে, এটা কিরকম গদ্যোপযোগী শোনায়!—বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্চে—বাতাস বচ্চে, এবং সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে আস্‌চে। বহুকষ্টে আমার অক্ষর দেখ্‌তে পাচ্চি—দিনের আলো সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হবার পূর্ব্বেই চিঠিটা শেষ করে ফেলবার জন্যে একেবারে হুহু করে লিখে চলেছি—চিন্তাশক্তি মাঝে মাঝে বিশ্রাম করবার কিম্বা নূতন steam সঞ্চয় করবার অবসর পাচ্চে না— কিন্তু আজ বোধ হয় শেষ হল না—কাল সকালে শেষ করা যাবে।—

ভরসা করি এ চিঠিটা যখন তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছবে, তখন চুয়োডাঙ্গার আকাশ অন্ধকার করে মেঘ করেছে, এবং সমস্ত প্রান্তর ব্যাপ্ত করে ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হচ্চে। নইলে রোদ্দুরে যদি চারদিক ধূ ধূ করতে থাকে, ঘাসগুলি যদি সমস্ত শুকিয়ে হল্‌দে হয়ে এসে থাকে, এবং আকাশের কোন প্রান্তভাগে যদি মেঘের আশ্বাসমাত্র না থাকে, তাহলে এই বর্ষাজীবী চিঠিটা নিতান্ত অকালমৃত্যুর হাতে গিয়ে পড়বে। বর্ষাকালটা কিনা প্রকৃতির সাধারণ অবস্থার একটা ব্যতিক্রম দশা; সূর্য্য নক্ষত্র প্রভৃতি প্রকৃতির সর্ব্বাপেক্ষা নিত্য লক্ষণগুলি বিলুপ্ত, তারি স্থানে ক্ষণিক মেঘের ক্ষণিক রাজত্ব,—প্রকৃতির দৈনন্দিন জগতের বিচিত্র জীবনকলরব মৌন—তারি স্থানে অবিশ্রাম একতান বৃষ্টির ঝর্‌ঝর্ শব্দ—সবসুদ্ধ এই রকম ক্ষণস্থায়ী একটা বিপর্য্যয় ভাব। সুতরাং প্রকৃতি প্রকৃতিস্থ হবামাত্রই একটু রোদ্ উঠলেই বর্ষার কথা সমস্ত ভুলে যেতে হয়—বর্ষার সম্পূর্ণ ভাবটি আর মনের মধ্যে আনা যায় না।—তাই আশঙ্কা হচ্চে পাছে চিঠিটা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নতাপের সময় তোমার হাতে গিয়ে পৌঁছয়।

চিঠির একটা মস্ত অভাব হচ্চে ঐ—বৃষ্টির চিঠি রৌদ্রের সময় গিয়ে পৌঁছয়, সন্ধ্যের চিঠি সকালে উপস্থিত হয়—উভয়পক্ষের মধ্যে পরিপূর্ণ সমবেদনা থাকে না। ঘনীভূত অন্ধকার সায়াহ্নে বাতি জেলে একলা বসে যে চিঠিটা লেখা হয়, সেটা যদি তুমি প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালনপূর্ব্বক সপরিবারে চা-রুটি সেবন করতে করতে পাঠ কর, তাহলে কিরকম পাপানুষ্ঠান হয় ভেবে দেখ দেখি—চুরি ক'রে লোকের ডায়ারি পড়লে যে পাপ হয়, এটা তার চেয়ে কিছু কম নয়।

তোমার এবারকার চিঠিতেও "ছবি ও গানের" কথা আছে—বিষয়টা আমার পক্ষে খুব মনোরম সন্দেহ নেই। আজকাল যে-সকল কবিতা লিখচি, তা "ছবি ও গান" থেকে এত তফাৎ যে, আমি ভাবি আমার লেখার আর কোথাও পরিণতি হচ্চে না, ক্রমাগতই পরিবর্ত্তন চলেছে। আমি বেশ অনুভব করতে পারচি, আমি যেন আর একটা পরিবর্ত্তনের সন্ধিস্থলে আসন্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছি। এরকম আর কতকাল চল্‌বে তাই ভাবি। অবশেষে একটা জায়গা ত পাব, যেটা বিশেষরূপে আমারি জায়গা। অবিশ্রাম পরিবর্ত্তন দেখলে ভয় হয় যে, এতকাল ধরে এতগুলো যে লিখলুম, সেগুলো কিছুই হয়ত টিঁকবে না—আমার নিজের যেটা যথার্থ চরম অভিব্যক্তি, সেটা যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ এগুলো কেবল tentative ভাবে আছে। বাস্তবিক, কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা মিথ্যে, কবে যে ধরা পড়বে তার ঠিক নেই। কিন্তু আমি দেখেছি, যদিও এক এক সময়ে সন্দেহের অন্ধকারে মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়, এবং আমার পুরাতন সমস্ত লেখার উপরেই অবিশ্বাস জন্মে, তবু মোটের উপরে মন থেকে এই আত্ম-বিশ্বাসটুকু যায় না যে, যদি যথেষ্ট কাল বেঁচে থাকি, তাহলে এমন

একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমিতে গিয়ে পৌঁছব, যেখেন থেকে কেউ আমাকে স্থানচ্যুত করতে পারবে না। কিন্তু এরকম আত্মবিশ্বাস আরো সহস্র সহস্র লোকের ছিল এবং আছে, এবং তাদের ভ্রান্ত জীবন নিষ্ফল হয়েছে এবং হবে—অতএব এরকম আত্মবিশ্বাস কোন বিষয়ের প্রমাণ বলে ধ'রে লওয়া যায় না। এই দেখ, খুব এক চোট অহমিকার অবতারণা করা গেল—কিন্তু চারটে চিঠির কাগজ পোরাতে গেলে অবশেষে "অহং" বই আর গতি নেই—এতটি জায়গা জোড়া আর কারো সাধ্য নেই। আর সকল খবর, সকল আলোচনাই ফুরিয়ে যায়—এর কথা আর শেষ হয় না—অতএব দীর্ঘ চিঠির প্রত্যাশা কর যদি, ত সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এই অহম্পুরুষকে বহুল পরিমাণে সহ্য করতে হবে।

* * * * *

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নূতন ও পুরাতন।

—:*:—

আজ যেটাকে আমরা পুরাতন বল্‌ছি এমন একদিন গিয়েছে যখন সেটা নতুনের মুকুট মাথায় দিয়ে এসে তরুণের বুকে বুকে পুলক সঞ্চার করে' গিয়েছিল—আর আজ যেটাকে আমরা নতুন বল্‌ছি এমন একদিন আস্‌বে যখন সেটাকে আপনা-আপনি পুরাতনের জীর্ণকন্থার অন্তরালে ধীরে ধীরে লুকিয়ে যেতে হবে। তাই আজ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি পুরাতন খালি পুরাতনই নয়—নতুনও খালি নতুনই নয়। পুরাতনের সার্থকতা নূতনেই আর নূতনের জন্ম পুরাতনেই। এই সত্য দেখ্‌তে পাচ্ছি বলেই, আজ আমরা নতুনকে আলিঙ্গন কর্‌তে কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত নই। যে ক্রমাগত যুগ যুগ ধরে' আমাদের দিকে অগ্রসর হ'য়ে আস্‌ছে আমাদেরও তার দিকে অগ্রসর হ'তে হবে নইলে আমাদের সত্যিকার মিলন কিছুতেই হবে না। তাই আমরা আজ নতুনেরই হাত ধরে', বুকের পঞ্জরে পঞ্জরে যে বিদ্যুৎ ছুট্‌ছে, হৃদয়ের তলে তলে যে রক্তধারা বইছে তারি তালে তালে চল্‌ব। এ নতুন যে আমাদের সেই পুরাতনেরই দান। এ দান অগ্রাহ্য করে' পুরাতনের অপমান কর্‌তে আমরা পার্‌ব না।

এই নতুনকে যারা অগ্রাহ্য কর্‌বে তারা নিজেকেই অগ্রাহ্য কর্‌বে —আর যারা নিজেকে অগ্রাহ্য কর্‌বে তারা অপরের দ্বারা গ্রাহ্য হবে না, নিশ্চয়। তাদের দিকে তাকিয়ে সবার আগে হাস্‌বে সেই

পুরাতন যাকে তারা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিল। পুরাতনকে সনাতন করে' যারা জীবন কাটাতে চাইবে তাদের জীবন কাট্‌বে বটে কিন্তু তাদের মহত্ত্ব কোন দিনই ফুট্‌বে না। আর তাদের ঘরে লক্ষ্মীই হ'ন সরস্বতীই হ'ন কোন দিনই আস্‌বেন না। কারণ দেবদেবীদের সবারই চিরযৌবন। তাঁরা আসেন সেইখানে যেখানে তাজা প্রাণের তাজা আনন্দ দিয়ে মন্দির তৈরী করা হয়েছে। আর তাজা প্রাণের তাজা আনন্দ নতুনের মধ্যেই আছে। পুরাতনের মধ্যে যা আছে সেটা প্রাণের আনন্দ নয় সেটা হচ্ছে প্রাণের আরাম। আর আরাম জিনিসটা আনন্দের ঠিক উল্‌টো দিক।

পুরাতনই যে সনাতন নয়—বরং সনাতন, পুরাতন ও নূতন এ দুটোকে নিয়ে—এ যারা বুঝ্‌বে জগতে জয় হবে তাদের। আর যারা পুরাতনকে সনাতন নাম দিয়ে "অচলায়তন" গড়ে' তুল্‌বে তারা মানুষের অমর্য্যাদা কর্‌বে, এ-সৃষ্টির অমর্য্যাদা কর্‌বে—তাদের ভাগ্যে যা মিল্‌বে সেটা ইহলোকেরও ভুক্তি নয়, পরকালেরও মুক্তি নয়। কারণ ভুক্তি ও মুক্তি এ দুটোই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃতিতে।

আজ যে আমরা পিছনে পড়ে আছি তা আমরা, নতুনের সঙ্গে পা ফেলে' ফেলে' চল্‌তে পারি নি বলে, নতুনের ডাক শুনি নি বলে'। পুরতনেরই গায়ে সিঁদুর চন্দন ঘসে' ঘসে' তাকে আমরা উজ্জ্বল করে' রাখ্‌তে চেষ্টা করেছি—সে পুরাতনের ভিতর থেকে যে কখন প্রাণ বেরিয়ে গিয়ে সেটা ধীরে ধীরে "মাম্মিতে" পরিণত হয়েছে তা আমাদের চোখেই পড়ে নি। পুরাতনকে সনাতন করে' আমরা মনুষ্যত্বকে আয়ত্ত কর্‌বার চেষ্টা করেছি—কিন্তু পুরাতনের অত্যাচারে, পচা সিঁদুর আর চন্দনের গন্ধে "মানুষ" যে কখন আমাদের ভিতর

থেকে বেরিয়ে পড়ে' কোথায় চম্পট দিয়েছে তা আমাদের লক্ষ্যেই আসে নি। আমরা মনে করেছি—বেশ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে, সমাতনত্বের বাতিটা আমরাই ঠিক জ্বালিয়ে বসে' আছি।

এই নূতনের বার্ত্তা যেখানে যেখানে মান পায় নি সেখানে সেখানেই মানুষের ভাগ্যে জুটেছে শুধু অপমান। পৃথিবীর ইতিহাসে এর বড় বড় উদাহরণ আছে। আমরাও যদি এই নতুনের বার্ত্তা না শুনি, এই নতুনের সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে' চল্‌তে না শিখি তবে এমন একদিন আস্‌বে যখন আমরা জাতিকে—জাতি এ ধরাধাম থেকে চলে যাব—আর সেটা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করে' নয়—সজ্ঞান-দুঃখ ভোগ করে' করে'।

যারা নতুনের মধ্যে কোন সত্যেরই সন্ধান পেয়ে ওঠে না তারা যে এ জগতটাকে অসত্য বলেই ঘোষণা কর্‌বে তা'তে আর বিচিত্র কি? কারণ তাদের কাছে সত্য আর কোথাও নেই, শুধু এক শূন্যে ছাড়া। যেহেতু শূন্যেরই কোন পরিবর্ত্তন নেই। আর যারা শূন্যেই তাদের সব সত্য প্রতিষ্ঠা করে' বসে' আছে তাদের যে এ জগতে লাভের ঘরে চারিদিক থেকে খালি শূন্যই জমা হবে সেটা নিতান্তই ন্যায় বিচার। তাদের কথায়, আচারে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে, মর্ম্মে শুধু সেই শূন্যই রকমফের হ'য়ে ফিরবে। এই শূন্যকে পুঁজি করে' কোন জাত কোন দিন বড় হ'তে পারে নি। আর গণিতশাস্ত্রের এ কথাটা ত সবারই জানা আছে যে যত কোটীই হোক্ না কেন তাকে শূন্য দিয়ে গুণ কর্‌লে তার যা গুণফল হয় সেটা শুধু শূন্য।

নূতনের মধ্যে আমরা কোন সত্যকে দেখি নে বলে' আমরা শৈশবকে হাস্‌তে দিই নে কৈশোরকে খেল্‌তে দিই নে, যৌবনকে

চঞ্চল হ'তে দিই নে। কিন্তু যৌবনের চাঞ্চল্যেই যে চঞ্চলা বসে' আছেন জগতের ইতিহাসে এটা এ পর্য্যন্ত কোথাও অপ্রমাণিত হয় নি। শিশুর মুখের হাসি শুখিয়ে উঠ্‌লে, কৈশরের বুকের নৃত্য থামিয়ে দিলে, যৌবনটা অচঞ্চল হ'তে বাধ্য। কিন্তু সে অচঞ্চলতা বিরাটও নয় স্বরাটও নয়। সে অচঞ্চলতা হচ্ছে আনন্দহীনের, প্রাণহীনের—সুতরাং অক্ষমতার। আমরা যে শিশুর জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা পুরাতনের খোলস্ পরিয়ে দিই, সেটা শিশু যৌবনে পৌঁছিলে তার গায়ে এমনি করে এঁটে বসে, যে তা'তে মরণ-পথের যাত্রীর যতই সুবিধে হোক্ না কেন জীবন-পথের যাত্রীর পক্ষে সেটা মস্ত অবিচার। যৌবনে যে আনন্দহাসি প্রাণে প্রাণে খেল্‌ছে তা খসিয়ে নিয়ে মানুষকে বার্দ্ধক্যের আরাম-প্রয়াসী করে' তুল্‌লে এ জগতের কর্ম্ম-ব্যঞ্জনা ত তাকে পীড়া দেবেই—এবং বিশ্বব্যাপী এই বিরাট লীলা তার চোখে অসত্যই হ'য়ে উঠ্‌বে, আর নির্ব্বাণ মুক্তিটাই যে আকাঙ্খ্য হ'য়ে উঠ্‌বে তা আমরা চোখের সাম্‌নেই দেখ্‌তে পাচ্ছি।

কিন্তু সবার চেয়ে আশার কথা হচ্ছে এই যে, জগতের ইতিহাসে নতুনের পরাজয় কোন খানে হয় নি—আর সেই নতুনের ডাক আজ বাংলা দেশে এসেছে। এই নতুনের ডাকে বাংলাকে সাড়া দিতেই হবে—কারণ নতুনের যে শক্তি তার মধ্যে গতি আছে আর জীবন্ত মানুষ গতিই চায়। আর গতিশীল মানুষেরই ক্ষতির সম্ভাবনা কম। যদি বা কোন ক্ষতি হয় তবে সেটাকে গতির বেগে একদিন—না—একদিন ভেসে যেতেই হবে—কিছুতেই চিরকাল টিঁকে থাক্‌তে পার্‌বে না। এই জন্যই আমরা গতির এত পক্ষপাতী। গতির

খাতায় মানুষের লাভ-লোকসানের জমা-খরচে কখনও ফাজিল দাঁড়ায় না।

তবুও পিছনে পড়ে' থাক্‌বার জন্যেই যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা থাক্‌। তাদের টেনে চল্‌তে গেলে রাস্তার ভারই বাড়বে, গতির বেগ বাড়্‌বে না কিছুতেই। বিশেষতঃ এই যে পিছনের টান—এই যে পুরাতনের শক্তি তা আপনার অজ্ঞাতসারে নতুনকে অগ্রসর করে' দেওয়ার এত সাহায্য করে' যে আর কিছুতেই তেমন করে না। গান কর্‌তে কর্‌তে যেমন গলা খোলে, বিপরীত শক্তিকে পরাভূত কর্‌তে কর্‌তে তেমনি শক্তি খোলে। সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে পুরাতন যেরকম বাধা বলেই মনে হোক্‌ না কেন, প্রকৃত পক্ষে সে নতুনকে সাহায্য করেই চলেছে। সুতরাং পুরাতনের যে শক্তি তা থাকা শুধু যে বাঞ্ছনীয় তাই নয়, তা অত্যন্ত ভাবেই প্রয়োজনীয়।

প্রথমে এই নতুনকে অল্পকয়েকজনই আলিঙ্গন কর্‌বে। কারণ প্রথম প্রথম নতুনের যে শক্তি তাতে ভার চাই নে—তাতে চাই ধার। নতুন বোঝা নয়। সে ভার দিয়ে পুরাতনকে চেপে রাখ্‌তে চায় না। সে চায় ধার দিয়ে পুরাতনের বন্ধন কেটে দিতে। এক এক করে' যখন পুরাতনের সমস্ত বন্ধন কাটা পড়ে যাবে, সমস্ত পূর্ব্ব-অর্জ্জিত সংস্কার থেকে সে মুক্ত হবে তখনই—আর সত্যও দেখ্‌তে পাবে সে তখনই। আর যে দিন সত্য দেখ্‌তে পাবে সে দিন পুরাতন হাসি মুখে এসে নতুনের পাশে দাঁড়াবে ও গৌরব করে' বলবে—নতুন, সে ত আমিই গড়ে তুলেছি—সে ত আমারই দান।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।